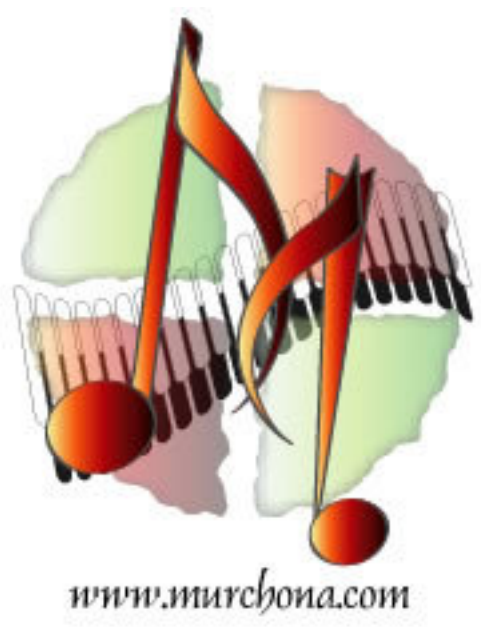

Deshe Bideshe by Syed Mujtoba Ali

[Part.2]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

সতর

কাবুলে দুই নম্বরর দ্রষ্টব্য তার বাজার। অমৃতসর, আগ্রা, কাশীর পুরানো বাজার যাঁরা দেখেছেন, এ বাজারের গঠন তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। সরু রাস্তা, দুদিকে বুক-উঁচু ছোট ছোট খোপ। পানের দোকানের দুই বা তিন-ডবল সাইজ। দোকানের সামনের দিকটা খোলা বাক্সের ঢাকনার মত এগিয়ে এসে রাস্তার খানিকটা দখল করেছে। কোনো কোনো দোকানের বাক্সের ডালার মত কব্জা লাগানো, রাত্রে তুলে দিয়ে দোকানে নিচের আধখানা বন্ধ করা যায়—অনেকটা ইংরেজীতে যাকে বলে 'পুটিঙ আপ দি শাটার।'

বুকের নিচ থেকে রাস্তা অবধি কিংবা তারো কিছু নিচে দোকানেরই একতলা গুদাম-ঘর, অথবা মুচির দোকান। কাবুলের যে কোনো বাজারে শতকরা ত্রিশটি দোকান মুচির। পেশাওয়ারের পাঠানরা যদি হপ্তায় একদিন জুতোতে লোহা পোঁতায়, তবে কাবুলে তিন দিন। বেশীরভাগ লোকেরই কাজ-কর্ম নেই—কোনো একটা দোকানে লাফ দিয়ে উঠে বসে দোকানীর সঙ্গে আড্ডা জমায়, ততক্ষণ নিচের অথবা সামনের দোকানের একতলায় মুচি পয়জারে গোটা কয়েক লোহা ঠুকে দেয়।

আপনি হয়ত ভাবছেন যে দোকানে বসলে কিছু একটা কিনতে হয়। আদপেই না। জিনিসপত্র বেচার জন্য কাবুলী দোকানদার মোটেই ব্যস্ত নয়। কুইক টার্নওভার নামক পাগলা রেসের রেওয়াজ প্রাচ্যদেশীয় কোনো দোকানে নেই। এমন কি কলকাতা থেকেও এই গদাইলস্করী চাল সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। চিৎপুরের শালওয়ালা, বড়বাজারের আতর-ওয়ালা এখনো এই আরামদায়ক ঐতিহ্যটি বজায় রেখেছে।

সুখদুঃখের নানা কথা হবে—কিন্তু পলিটিক্স ছাড়া। তাও হবে, তবে তার জন্য দোস্তি ভালো করে জমিয়ে নিতে হয়। কাবুলের বাজার ভয়ঙ্কর ধূর্ত—তিনদিন যেতে না যেতেই তামাম বাজার জেনে যাবে আপনি ব্রিটিশ লিগেশনে ঘন ঘন গতায়াত করেন কিনা—ভারতবাসীর পক্ষে রাশিয়ান দূতাবাস অথবা আফগান ফরেন আপিসের গোয়েন্দা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। যখন দোকানী জানতে পারে যে, আপনি হাই-পলিটিক্স নিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় খেলাধুলা করেন না, তখন 'আপনাকে 'বাজার গপ' বলতে তার আর বাধবে না। আর সে অপূর্ব

www.MurchOna.com

গপ—বল্‌শেভিক তুর্কীস্থানের স্ত্রী-স্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে, পেশাওয়ারের জানকীবাঈকে ছাড়িয়ে দিল্লীর বড়লাটের বিবিসায়েবের বিনে পয়সায় হিরা-পান্না কেনা পর্যন্ত। যে সব গল্পের কতটা গাঁজা কতটা নীট ঠাহর হবে কিছুদিন পরে, যদি নাক-কান খোলা রাখেন। তখন বাদ দরকসর টাকায় বারো আনা, চোদ্দ আনা ঠিক-ঠিক ধরতে পারবেন।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের পক্ষে এই 'বাজার গপ' অতীব অপরিহার্য। মোগল ইতিহাসে পড়েছি, দিল্লীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র করে এক কালে সমস্ত ভারতবর্ষ এমন কি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তুর্কীস্থান ইরান পর্যন্ত ভারতীয় হুন্ডির তাঁবেতে ছিল। গুণীদের মুখে শুনেছি বাঙলার রাজা জগৎশেঠের হুন্ডি দেখলে বুখারার খান পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে কাঁচা টাকা ঢেলে দিতেন। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ব্যবসা চালু রাখার জন্য ভারতীয় বণিকদের আপন আপন ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত ছিল। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। হয়ত দিল্লীর শাহানশাহ আহমদাবাদের সুবেদারের (গভর্নর) উপর বীতরাগ হয়ে তাকে ডিসমিসের ফরমান জারি করলেন—সে ফরমান আহমদাবাদ পেঁছতে অন্ততঃ দিন সাতেক লাগার কথা। ওদিকে সুবেদার হয়ত দু'হাজার ঘোড়া কেনার জন্য আহমদাবাদী বেনেদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন—ফরমান পেঁছলে সুবেদার পত্রপাঠ দিল্লী রওনা দেবেন। সে টাকাটা বের করতে বেনেদের তখন ভয়ংকর বেগ পেতে হত—সুবেদার বাদশাহকে খুশী করে নূতন সুবা, নিদেনপক্ষে নূতন জায়গীর না পেলে সে টাকাটা একেবারেই মারা যেত।

তাই যে সন্ধ্যায় বাদশা ফরমানে মোহর বসালেন, সেই সন্ধ্যায়ই বেনেদের দিল্লীর হৌস থেকে আপন ডাকের ঘোড়াসওয়ার ছুটত আহমদাবাদে। সেখানকার বিচক্ষণ বেনে বাদশাহী ফরমান পেঁছবার পূর্বেই সুবেদারের হিসেবে ঢেরা কেটে দিত—পাওনা টাকা যতটা পারত উশুল করত—নূতন এক্সচেঞ্জ ড্রাফ্‌ট কিছুতেই দিত না ও দরকার হলে দেবার দায় এড়াবার জন্য হঠাৎ পালিতাণায় 'তীর্থভ্রমণে' চলে যেত। তিনদিন পর ফরমান পেঁছলে পর সুবেদারের চোখ খুলত। তখন বুঝতে পারতেন বেনে হঠাৎ ধর্মানুরাগী হয়ে পালিতাণার কোন্ তীর্থ করতে চলে গিয়েছিল।

আফগানিস্থানে এখনো সেই অবস্থা। বাদশা কাবুলে বসে কখন হিরাত অথবা বদখশান সুবার কোন্ কর্ণধারের কর্ণ কর্তন করলেন, তার খবর না জেনে বড় ব্যবসা করার উপায় নেই। তাই 'বাজার গপের' ধারা কখন কোন্ দিকে চলে, তার দিকে কড়া নজর রাখতে হয়, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফিলটার যদি আপনার থাকে, তবে সেই ঘোলাটে 'গপ্'

www.MurchOna.com

থেকে খাঁটি-তত্ত্ব বের করে আর দশজনের চেয়ে বেশী মুনাফা করতে পারবেন।

আফগানিস্থানের ব্যাঙ্কিং এখনো বেশীর ভাগ ভারতীয় হিন্দুদের হাতে। ভারতীয় বলা হয়ত ভুল, কারণ এদের প্রায় সকলেই আফগানিস্থানের প্রজা। এদের জীবনযাত্রার প্রণালী, সামাজিক সংগঠন, পালা-পরব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো গবেষণা করেননি।

আশ্চর্য বোধ হয়। মরা বোরোবোদুর নিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পড়ে, একই ফোটোগ্রাফের বিশখানা হাজা-ভোঁতা প্রিন্ট দেখে দেখে সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায়, কিন্তু এই জ্যান্ত ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে 'বৃহত্তর ভারতের' পাণ্ডাদের কোনো অনুসন্ধিৎসা কোনো আত্মীয়তাবোধ নেই।

মৃত বোরোবোদুর গোত্রভুক্ত, জীবন্ত ভারতীয় উপনিবেশ অপাংক্তেয়, ব্রাত্য। ভারতবর্ষের সধবারা তাজা মাছ না খেয়ে শুঁটকি মাছের কাঁটা দাঁতে লাগিয়ে একাদশীর দিনে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখেন।

কাবুলের বাজার পেশাওয়ারের চেয়ে অনেক গরীব, কিন্তু অনেক বেশী রঙীন। কম করে অন্তত পঁচিশটা জাতের লোক আপন আপন বেশভুষা চালচলন বজায় রেখে কাবুলের বাজারে বেচাকেনা করে। হাজারা, উজবেগ (বাঙলা উজবুক), কাফিরিস্থানী, কিজিলবাশ (ভারতচন্দ্রে কিজিলবাশের উল্লেখ আছে, আর টীকাকার তার অর্থ করেছেন 'একরকম পর্দা' !) মঙ্গোল, কুর্দ এদের পাগড়ি, টুপি, পুস্তিনের জোব্বা, রাইডিং বুট দেখে কাবুলের দোকানদার এক মুহূর্তে এদের দেশ, ব্যবসা, মুনাফার হার, কঞ্জুশ না দরাজ হাত চট করে বলে দিতে পারে।

এই সব পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তারা নির্বিকার চিত্তে রাস্তা দিয়ে চলে। আমরা মাড়োয়ারী কিংবা পাঞ্জাবীর সঙ্গে লেনদেন করার সময় কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, তারা বাঙালী নয়—দু'পয়সা লাভ করার পর কোনো পক্ষই অন্য পক্ষকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, হোটেলে ডেকে নেওয়ার রেওয়াজ পর্যন্ত নেই। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত।

স্বপ্নসম লোকযাত্রা। খাস কাবুলের বাসিন্দারা চিৎকার করে একে অন্যকে আল্লারসুলের ভরভয় দেখিয়ে সওদা করছে, বিদেশীরা খচ্চর গাধা ঘোড়ার পিঠে বসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফার্সীতে দরকসর করছে, বুখারার বড় কারবারী ধীরে গম্ভীরে দোকানে ঢুকে এমনভাবে আসন নিচ্ছেন যে, মনে হয় বাকী দিনটা ঐখানেই বেচাকেনা, চা-তামাক-পান আর আহারাদি করে রাত্রে সরাইয়ে ফিরবেন—তাঁর পিছনে চাকর হুঁকো-কল্কি সঙ্গে নিয়ে ঢুকছে। তারও পিছনে খচ্চর-বোঝাই বিদেশী কার্পেট। আপনি উঠি উঠি

www.MurchOna.com

করছিলেন, দোকানদার কিছুতেই ছাড়বে না। হয়ত মোটা রকমের ব্যবসা হবে, খুদা মেহেরবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রসুলেরও আশীর্বাদ রয়েছে, আপনারও যখন ভয়ংকর তাড়া নেই, তখন দাওয়াতটা খেয়ে গেলেই পারেন।

রাস্তায় অনেক অকেজো ছেলে-ছোকরা ঘোরাঘুরি করছে—তাদেরই একটাকে ডেকে বলবে, 'ও বাচ্চা, চাওয়ালাকে বলতো আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে যেতে।'

তারপর সেই সব কার্পেটের বস্তা খোলা হবে। কত রঙ, কত চিত্র-বিচিত্র নক্সা, কী মোলায়েম স্পর্শসুখ। কার্পেট-শাস্ত্র অগাধ শাস্ত্র—তার কূল-কিনারাও নেই। কাবুলের বাজারে অন্তত ত্রিশ জাতের কার্পেট বিক্রি হয়, তাদের আবার নিজের জাতের ভিতরে বহু গোত্র, বহু বর্ণ। জন্মভূমি, রঙ, নক্সা, মিলিয়ে সরেস নিরেস মালের বাছ-বিচার হয়। বিশেষ রঙের নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট পশম দিয়ে তৈরী হয়—সে মালের সস্তা জিনিস হয় না। এককালে বেনারসী শাড়িতে এই ঐতিহ্য ছিল—আড়িবেল শাড়ির বিশেষ নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট রেশমেই হত—সে নক্সায় নিরেস মাল দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা ছিল না।

আজকের দিনে কাবুলের বাজারে কেনবার মত তিনটে ভালো জিনিস আছে—কার্পেট, পুস্তিন আর সিল্ক। ছোটখাটো জিনিসের ভিতর ধাতুর সমোভার আর জড়োয়া পয়জার। বাদবাকী বিলাতী আর জাপানী কলের তৈরী সস্তা মাল, ভারতবর্ষ হয়ে আফগানিস্থানে ঢুকেছে।

কাবুলের বাজার ক্রমেই গরীব হয়ে আসছে। তার প্রধান কারণ ইরান ও রুশের নবজাগরণ। আমুদরিয়ার ওপারের মালে বাঁধ দিয়ে রাশানরা তার স্রোত মস্কোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, ইরানীরা তাদের মাল সোজা-সুজি ইংরেজ অথবা রাশানকে বিক্রি করে। কাবুলের পয়সা কমে গিয়েছে বলে সে ভারতের মাল আর সে পরিমাণে কিনতে পারে না—আমাদের রেশম মলমল মসলিন শিল্পেরও কিছু মরমর, বেশীরভাগ ইংরেজ সাত হাত মাটির নিচে কবর দিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি করে চুকিয়ে দিয়েছে।

বাবুর বাদশা কাবুলের বাজার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বহু জাতের ভিড়ে কান পেতে যে-সব ভাষা শুনেছিলেন, তার একটা ফিরিস্তিও তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন ঃ—

আরবী, ফার্সী, তুর্কী, মোগলী, হিন্দী, আফগানী, পশাঈ, প্রাচী, গেবেরী, বেরেকী ও লাগমানী।

'প্রাচী' হল পূর্ব-ভারতবর্ষের ভাষা, অযোধ্যা অঞ্চলের পুরবীয়া—বাঙলা ভাষা তারই আওতায় পড়ে।

www.MurchOna.com

সে সব দিন গেছে; তামাম কাবুলে এখন যুক্তপ্রদেশের তিনজন লোকও আছে কিনা সন্দেহ।

তবু প্রাণ আছে, আনন্দ আছে। বাজারের শেষপ্রান্তে প্রকান্ড সরাই। সেখানে সন্ধ্যার নামাজের পর সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য কাজকর্মে ইস্তাফা দিয়ে বেঁচে থাকার মূল চৈতন্যবোধকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের রসগ্রহণ দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে। মঙ্গোলরা পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে, ভারী রাইডিং বুট পরে, বাবরী চুলে ঢেউ খেলিয়ে গোল হয়ে সরাই-চত্বরে নাচতে আরম্ভ করে। বুটের ধমক, তালে তালে হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুল শহরের চতুর্দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনিত করে তীব্র কন্ঠে আমুদরিয়া-পারের মঙ্গোল সঙ্গীত। থেকে থেকে নাচের তালের সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নিচু করে দেয়, আর কানের দু'পাশের বাবরী চুল সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলে। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু'পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটে, আর দু'হাত মেলে দিয়ে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনের দিকে ঠেলে বাবরী চুল দিয়ে সবুজ জামা ঢেকে দেয়। কখনো কোমর দু'ভাঁজ করে নিচু হয়ে বিলম্বিত তালে আস্তে আস্তে হাততালি, কখনো দু'হাত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে ঘূর্ণি হাওয়ার চর্কিবাজী। সমস্তক্ষণ চক্কর ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

আবার এই সমস্ত হট্টগোল উপেক্ষা করে দেখবেন, সরাইয়ের এক কোণে কোনো ইরানী কানের কাছে সেতার রেখে মোলায়েম বাজনার সঙ্গে হাফিজের গজল গাইছে। আর পাঁচজন চোখ বন্ধ করে বুঁদ হয়ে দূর ইরানের গুল বুলবুল আর নিষ্ঠুরা নির্দয়া প্রিয়ার ছবি মনে মনে এঁকে নিচ্ছে।

আরেক কোণে পীর-দরবেশ চায়ের মজলিসের মাঝখানে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ-কাহিনী মেশেদ-কারবালা, মক্কা-মদিনার তীর্থের গল্প বলে যাচ্ছেন। কান পেতে সবাই শুনছে, বুড়োরা ভাবছে কবে তাদের উপর আল্লার করুণা হবে, মৌলা কবে তাদের মদিনায় ডেকে নিয়ে যাবেন, প্রাণ তো ওষ্ঠাগত,—

লবোঁ পর হৈ দম আর মুহম্মদ সমহালো,
মেরে মৌলা মুঝে মদিনে বোলা লো!

ঠোঁটের উপর দম এসে গেছে বাঁচাও মুহম্মদ,
হে প্রভু আমায় ডাকো মদিনায়, ধরেছি তোমার পদ।

পুস্তিন ব্যবসায়ীর কুঠরিতে কবির মজলিস। অজাতশ্মশ্রু সুনীল-গুম্ফ, কাজল-চোখ, তরুণ কবি মোমবাতির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তুলোট কাগজে লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। তাঁর এক পদ পড়ার

www.MurchOna.com

সঙ্গে সঙ্গে তামাম মজলিস একগলায় পদের পুনরাবৃত্তি করছে—মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে মরহাবা, আফরীন, শাবাশ বলে উচ্চকণ্ঠে কবির তারিফ করছে।

চার সর্দারজীতে মিলে একটা পুরানো গ্রামোফোনে নখের মতো পালিশ তিনখানা রেকর্ড ঘুরিয়ে বাজাচ্ছে—

হরদি বোতলাঁ
ভরদি বোতলাঁ
পাঞ্জাবী বোতলাঁ
লাল বোতলাঁ

হায়, কাবুলে বোতল বারণ। কে জানত, শ্রবণেও অর্ধপান!

আর আসল মজলিস বসেছে কুহিস্থানের তাজিকদের আড্ডায়। হেঁড়ে গলায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, দেয়াল-পাথর ফাটিয়ে কোরাস গান,

আয় ফতু, জানে মা—
ফতুজান,
ফতুজান,
বর তু শওম কুরবা—া—া—ন।

কুরবানের 'আ' দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব, অবস্থা ভেদে—সম মেলাবার জন্য। উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি নয়, তবু দরদ আছে,

ওগো ফতুজান,
তোঁহারি লাগিয়া দিল-জান দিয়া
হব আমি কুরবান!

উত্তরে ফতুজান যেন অবিশ্বাসের সুরে বলছেন,

—চেরা রফতী
হীচ ন্ গুফতী
দূর হিন্দুস্থান?

অর্থাৎ—

কেন গেলে
আমায় ফেলে
দূর হিন্দুস্থান?

সহস্রপদ বৈষ্ণব পদাবলীতে যখন এ প্রশ্নের উত্তর নেই, তখন তাজিক ছোকরার লোক-সঙ্গীতে তার উত্তরের আশা করেন কোন্ অভিনব মন্মট?

www.MurchOna.com

মথুরার সিংহাসন জয় হিন্দুস্থানে রাইফেল ক্রয়, দুটোই বদখদ বেতালা উত্তর। হাজারো যুক্তি দিয়ে গীতা বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু মথুরাজয়ের যুক্তির হাল যমুনায় পানি পাবে না বলেই তিনি সেটা ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধার দরবারে পেশ করেননি।

বল্‌হীকের বল্লভও তাই নীরব।

আঠার

কাবুলের সামাজিক জীবন তিন হিস্যায় বিভক্ত। তিন শরিকে মুখ দেখাদেখি নেই।

পয়লা শরিক খাস কাবুলী; সে-ও আবার দু'ভাগে বিভক্ত—জনানা, মর্দানা। কাবুলী মেয়েরা কট্টর পর্দার আড়ালে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে নিকট-আত্মীয় ছাড়া, দেশী-বিদেশী কারো আলাপ হওয়ার জো নেই। পুরুষের ভিতরে আবার দু'ভাগ। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের মোল্লা সম্প্রদায়, আর অন্যদিকে প্যারিস-বার্লিন-মস্কো ফের্তা এবং তাঁদের ইয়ার-বক্সীতে মেশানো ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা তরুণ সম্প্রদায়। একে অন্যকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু মুখ দেখাদেখি বন্ধ নয়। কারণ অনেক পরিবারেই বাপ মশাই, বেটা মসিয়ো।

দুসরা শরিক ভারতীয় অর্থাৎ পাঞ্জাব, ফ্রন্টিয়ারের মুসলমান ও ১৯২১ সনের খেলাফৎ আন্দোলনের ভারতত্যাগী মুহাজিরগণ। এঁদের কেউ কেউ কাবুলী মেয়ে বিয়ে করেছেন বলে শ্বশুরবাড়ির সমাজের সঙ্গে এঁরা কিছু কিছু যোগাযোগ বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিসরা শরিক ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, রুশ ইত্যাদি রাজদূতাবাস। আফগানিস্থান ক্ষুদে গরীব দেশ। সেখানে এতগুলো রাজদূতের ভিড় লাগবার কোনো অর্থনৈতিক কারণ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক কারণ বিস্তর। ফরাসী জর্মন ইতালী তুর্ক সব সরকারের দৃঢ়বিশ্বাস, ইংরেজ-রুশের মোষের লড়াই একদিন না একদিন হয় খাইবারপাসে, নয় হিন্দুকুশে লাগবেই লাগবে। তাই দু'দলের পাঁয়তারা কষার খবর সরজমিনে রাখার জন্য একগাদা রাজদূতাবাস।

তবু পয়লা শরিক আর দুসরা শরিকে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয়। দুসরা শরিকের অধিকাংশই হয় কারবারী, নয় মাস্টার প্রোফেসর। দু'দলের সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু পয়লা ও তেসরা ও দুসরা তেসরাতে কখনো কোনো অবস্থাতেই যোগাযোগ হতে পারে না।

www.MurchOna.com

যদি কেউ করার চেষ্টা করে, তবে সে স্পাই।

মাত্র একটি লোক নির্ভয়ে কাবুলের সব সমাজে অবাধে গতায়াত করতেন। বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নাম দোস্ত মুহম্মদ খান—জাতে খাস পাঠান।

প্রথম দিনের পরিচয়ে শেকহ্যান্ড করে ইংরিজী কায়দায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হাও ডু ইয়ু ডু ?'

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ রাস্তায়। দূরের থেকে কাবুলী কায়দায় সেই প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন, 'খুব হাস্তী, জোর হাস্তী' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো ?'

তৃতীয় সাক্ষাৎ তাঁর বাড়িরই সামনে। আমাকে দেখা মাত্র চিৎকার করে বললেন, 'বফরমাইদ, বফরমাইদ (আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক), কদমে তান মবারক (আপনার পদদ্বয় পূতপবিত্র হোক), চশমে তান রওশন (আপনার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বলতর হোক), শানায়ে তান দরাজ (আপনার বক্ষস্কন্ধ বিশালতর হোক)—'

তারপর আমার জন্য যা প্রার্থনা করলেন সেটা ছাপলে এদেশের পুলিশ আমাকে জেলে দেবে।

আমি একটু থতমত খেয়ে বললুম, 'কি যা তা সব বলছেন ?'

দোস্ত মুহম্মদ চোখ পাকিয়ে তম্বী লাগালেন, 'কেন বলব না ? আলবত বলব, এক্‌শ' বার বলব। আমি কি কাবুলের ইরানী যে ভদ্রতা করে সব কিছু বলব, সত্যি কথাটি ছাড়া ? আমি পাঠান—আমার ঘোড়ার লাগাম নেই, আমার জিভেরও লাগাম নেই।'

ঘরে বসিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'বাড়ি-ঘরদোর গুছিয়ে নিয়েছেন তো ? চাকরবাকর ? রুটি-গোস্ত ? কিছু যদি দরকার হয় আমাকে বলবেন। সব যোগাড় করে দিতে পারি—কাবুলের তখ্‌তটি ছাড়া। তাও পারি—কিন্তু মাত্র একটা কিনা খোঁজ খোঁজ পড়ে যাবে। কিন্তু ওটার নজর দিয়ে কোনো লাভ নেই। বড্ড শক্ত; আমি বসে দেখেছি।'

আমি বললুম, 'কাবুলের সিংহাসনে বসা যে শক্ত, সে তো আর গোপন কথা নয়।'

দোস্ত মুহম্মদ আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ভয় পেয়ে ভাবলুম বোধ হয় বেফাঁস রসিকতা করে ফেলেছি। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদের উত্তর শুনে অভয় পেলুম। বললেন, 'আহা-হা-হা। বাঁচালে দাদা। তোমার তাহলে রসকষ আছে। তোমার দেশের লোকগুলোর

www.MurchOna.com

সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, বড্ড বেহুল্লোড়, বে-আব্রু, বে-রসিক। কী গম্ভীর মুখ! দেখে মনে হয় হিন্দুস্থান স্বাধীন করার দুর্ভাবনা যেন একমাত্র ওদেরই ঘাড়ে।'

অদ্ভুত লোক! অশ্লীল কথা বললেন রাস্তায় চেঁচিয়ে, চাকর-বাকর বন্দোবস্ত করে দেবেন বললেন ঘরের ভিতর বসিয়ে ফিসফিস করে, রসিকতা শুনে যখন খুশী তখন মুখ হল গম্ভীর। ভাবলুম এবার যদি দুটো একটা কটুবাক্য বলি তবে বোধ হয় অট্টহাস্য করে উঠবেন।

ততক্ষণে তিনি একটা কুশনে মাথা দিয়ে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়েছেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, 'কি খাবে? চা-রুটি, পোলাও-গোস্ত, আঙুর-নাসপাতি? যা খুশী। বাজারে সব পাওয়া যায়। বাড়িতে কিছু নেই।'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'না, না, আছে, আছে। সিগরেট আছে। দাঁড়াও।'

বলে দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে গভীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে সোফার পিছনে হাঁটু গেড়ে সোফা আর দেয়ালের মাঝখানে কার্পেট তুলে এক প্যাকেট সিগরেট বের করলেন।

আমি তো অবাক। সামান্য সিগরেট; মদের বোতল নয়, প্যারিসের ছবি নয় যে, এত লুকিয়ে রাখবেন। আর কার কাছ থেকেই বা এত লুকোনো?

শুনি দোস্ত মুহম্মদ করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠেছেন, 'ওরে ও হারামজাদা আগা আহমদ, তোকে আমি আজ খুন করব। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে আয় ব্যাটা। ওরে নেমকহারাম, তোকে খুন করে, আজ আমি গাজী হব, ফাঁসি গিয়ে শহিদ হব।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঃ! কী পাষণ্ড! দরজা বন্ধ করে, হুড়কো মেরে সিগরেট বের করি, লুকিয়ে রাখি যেন আলাউদ্দীনের পিদিম। তবু ব্যাটা সন্ধান পেয়েছে। আর কী বেহায়া বেশরম। দশটা সিগরেটই মেরে দিয়েছে। ওঃ!'

ততক্ষণে আগা আহমদ দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে। কারো দিকে না তাকিয়ে দোস্ত মুহম্মদের কোনো কথায় সাড়া না দিয়ে সোজা সোফার পিছনে গিয়ে কার্পেটের তলায় আরো বেশী দূর হাত চালিয়ে আরেক প্যাকেট পুরো সিগরেট বের করে আমার হাতে দিল।

বেরবার সময় দোরের গোড়ায় একবার দাঁড়াল। এক ঝলকের তরে দোস্ত মুহম্মদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খালি প্যাকেটটা আমার। লুকিয়ে রেখেছিলুম।'

www.MurchOna.com

দোস্ত মুহম্মদের চোখের পাতা পড়ছে না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'কী অসম্ভব বদমায়েশ! আর আমাকে বেকুব বানাবার কায়দাটা দেখলেন গর্ভস্রাবটার! শুধু তাই, নিত্য নিত্য আমাকে বেকুব বানায়।'

তারপর মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আপন মনেই বললেন, 'কিন্তু দাঁড়াও বাচ্চা, স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্‌, কামারের এক ঘা।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর পাঁচ বছরের মাইনে তিন শ' টাকা আমার কাছে জমা আছে। সেই টাকাটা লোপাট মেরে রাইফেল কাঁধে করে একদিন পাহাড়ে উধাও হয়ে যাব; তখন যাদু টেরটি পাবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কলেজ যাবার সময় ঘরে তালা লাগান?'

তিনি বললেন, 'একদিন লাগিয়েছিলুম। কলেজ থেকে ফিরে দেখি সে তালা নেই, আরেকটা পর্বতপ্রমাণ তালা তার জায়গায় লাগানো। ভাঙবার চেষ্টা করে হার মানলুম। ততক্ষণে পাড়ার লোক জমে গিয়েছে—আগা আহমদের দর্শন নেই। কি আর করি, বসে রইলুম হী হী শীতে বারান্দায়। হেলে দুলে আগা আহমদ এলেন ঘন্টাখানেক পরে। পাষন্ড কি বলল জানো? 'ও তালাটা ভালো নয় বলে একটা ভালো দেখে তালা লাগিয়েছি।' আমি যখন মার মার করে ছুটে গেলুম তখন শুধু বললো, 'কারো উপকার করতে গেলেই মার খেতে হয়।'

আমি বললুম, 'তালা তাহলে আর লাগাচ্ছেন না বলুন।'

'কি হবে? আগা আহমদ আফ্রিদী, ওরা সব তালা খুলতে পারে। জানো, এক আফ্রিদী বাজী ফেলে আমীর হবীবউল্লার নিচের থেকে বিছানার চাদর চুরি করেছিল।'

আমি বললুম, 'তালা যদি না লাগান তবে একদিন দেখবেন আগা আহমদ আপনার দামী রাইফেল নিয়ে পালিয়েছে।'

দোস্ত মুহম্মদ খুশী হয়ে বললেন, 'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তত কাঁচা ছেলে নই। আগা আহমদের দাদা আমাকে আর বছরে ছ'শ টাকা দিয়েছিল ওর জন্য দাঁও মত একটা ভালো রাইফেল কেনার জন্য। এটা সেই টাকায় কেনা কিন্তু আগা আহমদ জানে না। ও যদি রাইফেল নিয়ে উবে যায় তবে আমি তার ভাইকে তক্ষুণি চিঠি লিখে পাঠাব, 'তোমার ভ্রাতহস্তে রাইফেল পাঠাইলাম, প্রাপ্তি-সংবাদ অতি অবশ্য জানাইবা।' তারপর দুই ভাইয়েতে—'

আমি বললুম, 'সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই।'

দোস্ত মুহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাইফেলের জন্য তারা লড়েছিল?'

আমি বললুম, 'না, সুন্দরীর জন্য।'

www.MurchOna.com

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তওবা! তওবা! স্ত্রীলোকের জন্য কখনো জব্বর লড়াই হয়? মোক্ষম লড়াই হয় রাইফেলের জন্য। রাইফেল থাকলে সুন্দরীর সোয়ামীকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করা যায়। উত্তম বন্দোবস্ত। সে বেহেস্তে গিয়ে হুরী পেল তুমিও সুন্দরী পেলে।'

রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ভেবো না, লক্ষ্য করিনি যে, তুমি আমাকে 'আপনি' বলছো আর আমি 'তুমি' বলে যাচ্ছি। কিন্তু বেশী দিন চালাতে পারবে না। সমস্ত আফগানিস্থানে আমাকে কেউ 'আপনি' বলে না, ইস্তেক আগা আহমদ পর্যন্ত না।'

টাঙ্গায় চড়বার সময় 'দাঁড়াও' বলে ছুটে গিয়ে একখানা বই নিয়ে এসে আমার হাতে গুজে দিলেন। মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'ভালো বই, কর্সিকা আর অফিগানিস্থানে একই রকম প্রতিশোধের ব্যবস্থা।' চেয়ে দেখি 'কল'বো।' *

উনিশ

দিন দশেক পরে একদিন জানলা দিয়ে দেখি, দোস্ত মুহম্মদ। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে কাবুলী কায়দায় 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো', বলতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, দোস্ত মুহম্মদ কোনো সাড়া-শব্দ না দিয়ে আপন মনে কি সব বিড়-বিড় করে বলে যাচ্ছেন। কাছে এসে কান পেতে যা শুনলুম, তাতে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। বলছেন, 'কমরত ব শিকনদ, খুদা তোরা কোর সাজদ, ব পুন্দী, ব তরকী' ইত্যাদি।

সরল বাঙলায় তর্জমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, 'তোর কোমর ভেঙে দু'টুকরো হোক, খুদা তোর দু'চোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা।'

আমি কোনো গতিকে সামলে নিয়ে বললুম, 'দোস্ত মুহম্মদ, কি সব আবোল-তাবোল বকছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ আমাকে আলিঙ্গন করে দু'গালে দুটো বম্‌শেল চুমো লাগালেন। বললেন, 'আমি কক্ষনো আবোল-তাবোল বকিনি।'

আমি বললুম, 'তবে এসব কি?'

বললেন, 'এসব তোর বালাই কাটাবার জন্য। লক্ষ্য করিসনি, এদেশে বাচ্চাদের সাজিয়ে-গুজিয়ে কপালের একপাশে খানিকটে ভুসো মাখিয়ে

---

* 'আগুনের ফুলকি' নাম দিয়ে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন।

www.MurchOna.com

দেয়। তোর কপালে তো আর ভুসো মাখাতে পারিনে—তাই কথা দিয়ে সেরে নিলুম। যাকে এত গালাগাল দিচ্ছি, যম তাকে নেবে কেন? পরমায়ু বেড়ে যাবে। বুঝলি?'

লক্ষ্য করলুম গেল বার দোস্ত মুহম্মদ আমাকে 'তুমি' বলে সমোধন করেছিলেন, এবারে সেটা 'তুই'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফার্সী ভাষায় 'আপনি, তুমি, তুই' তিন বাক্য নেই—আছে শুধু 'শোমা' আর 'তো।' কিন্তু ঐ 'তো' দিয়ে 'তুমি, তুই' দুই-ই বোঝানো যায়—যে রকম ইংরিজীতে যখন বলি, 'ড্যাম হউ,' তখন তার অর্থ 'আপনি চুলোয় যান' নয়, অর্থ তখন 'তুই চুলোয় যা।' খাঁটি পাঠান আবার 'শোমা' কথাটাও ব্যবহার করে না, ইংরেজের মত শুধু ঐ এক 'ইউ ই জানে। বেদুইনের আরবীতেও মাত্র এক 'আনতা।' বোধ হয় পাঠান, ইংরেজ, বেদুইনের ডিমোক্র্যাসি তার সমোধনের সমতায় প্রকাশ পেয়েছে।

দোস্ত মুহম্মদ স্মরণ করিয়ে দিলেন প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের ছোট ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন। সইফুল আলম তাঁকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে। গাড়ি তৈরী।

সিগরেট দিয়ে বললুম, 'খান।'

বললেন, 'না। আবদুর রহমানকে বলো তামাক দিতে।'

আমি বললুম, 'আবদুর রহমানকে চেনেন তাহলে।'

বললেন, 'তোমাকে কে চেনে বাপ, তুমি তো দু'দিনের চিড়িয়া, আমাকে কে চেনে বাপ, আমিও তিন দিনের পাখি—যে পাহাড় থেকে নেমে এসেছি, সে পাহাড়ের গর্ভে আবার ঢুকে যাব, আগা আহমদের টাকাটা মেরে। আমি কে? মকতবে আমানিয়ার অধ্যাপক অবিশ্যি বটি, কিন্তু ক'টা লোক জানে। অথচ বাজারে গিয়ে পুছো, দেখবে সবাই জানে, আমি হচ্ছি সেই মুর্খ, যার কাঁধে বন্দুক রেখে আগা আহমদ শিকার করে; অর্থাৎ আগা আহমদের মনিব। তুমি কে? যার কাঁধে আবদুর রহমান বন্দুক রেখেছে—শিকার করে কি না-করে পরে দেখা যাবে। চাকর দিয়ে মনিব চিনতে হয়।'

আমি বললুম 'বেশক্, বেশক্।' তারপর বাঙলায় বললুম, 'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা'।'

বললেন, 'বুঝিয়ে বল।'

তর্জমা শুনে দোস্ত মুহম্মদ আনন্দে আত্মহারা। শুধু বলেন, 'আফরীন, আফরীন, শাবাশ, শাবাশ, উম্‌দা কবিতা, জরির কলম।' তারপর মুখে মুখে শেষ লাইনের একটা অনুবাদও করে ফেললেন,—

www.MurchOna.com

'মনে বুরুৎ, তনে বুরুৎ, বুরুৎ সনাক্তদার।'

তারপর বললেন, 'আমি আরবী, ফার্সী আর তুর্কী নিয়ে কিছু কিছু নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু ভাল রসিকতা কোথাও বিশেষ দেখিনি। পদ্যে তো প্রায় নেই-ই। বাঙলায় বুঝি এরকম অনেক মাল আছে?'

আমি বললুম, 'না, মাত্র দুখানা কি আড়াইখানা বই।'

দোস্ত মুহম্মদ নিরাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে আর বাঙলা শিখে কি হবে।'

পেশাওয়ারের আহমদ আলী আর কাবুলের দোস্ত মুহম্মদে একটা মিল দেখতে পেলুম—দুজনই অল্প রসিকতায় খুব মুগ্ধ হন। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, আহমদ আলীর জীবনের ধারা বয়ে চলেছে আর পাঁচ-জনের মত, আর দোস্ত মুহম্মদের জীবন যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, মাঝখানে রসিকতার সূর্যকিরণ পড়লেই রামধনুর রঙ মেখে নিচ্ছে। দু-'একবার মামুলি দুঃখকষ্টের কথা বলতে গিয়ে দেখলুম, সে সব কথা তার কানে যেন পেঁাছচ্ছেই না। বিলাস ব্যসনেও শখ নেই। তিনি যেন সমস্তক্ষণ বোমবাগড়ের সন্ধানে যেখানে রাজার পিসি পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকেন, যেখানে পন্ডিতেরা টাকের উপর ডাকের টিকিট আঁটেন।

তাই যখন আমরা বিয়ের মজলিসে গিয়ে কাবুল শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝখানে আসন পেলুম, তখন দোস্ত মুহম্মদের জন্য দুঃখ হল। খাণিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কি যেন আপন মনে বলে যাচ্ছেন। তাঁর দিকে একটু ঝুঁকতেই তিনি বললেন, 'ফয়েজ মুহম্মদের গুণে শিক্ষামন্ত্রীর নাম, না শিক্ষামন্ত্রীর পদের জোরে ফয়েজ মুহম্মদের নাম—মুহম্মদ তর্জীর গুণে বিদেশী সচিবের নাম, না বিদেশী সচিবের পদের জোরে মুহম্মদ তর্জীর নাম? বাঙালী কবি লাখ কথার এক কথা বলেছে,

'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা'।'

আমি বললুম, 'চুপ, মন্ত্রীরা সব আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন, শুনতে পেলে আপনাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।'

বললেন, 'হঁা তা বটে, বিশেষ করে ঐ ফয়েজটা।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফয়েজ মুহম্মদ খান, মিনিস্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন?'

উত্তর দিলেন, 'না, মিনিস্টার অব পাবলিক ডিস্ট্রাকশন। কত ছেলের মগজ ডেস্ট্রয় করছে। আমাকে মারবে তার আর নূতন কি?'

www.MurchOna.com

আমি ভয় পেয়ে 'চুপ চুপ' বলে উজীর সায়েবদের 'জ্ঞানগর্ভ' কথাবার্তায় কান দেবার চেষ্টা করলুম।

দোস্ত মুহম্মদকে দোষ দেওয়া অন্যায়। অনেক ভেবেও কুল-কিনারা পাওয়া যায় না যে, এঁরা সব কোন্ গুণে মন্ত্রী হয়েছেন। লেখাপড়ায় এক-একজন যেন বিদ্যাসাগর। দুনিয়ার কোনো খবর রাখার চাড়ও কারো নেই। বেশীর ভাগই একবার দু'বার ইয়োরোপ হয়ে এসেছেন, কিন্তু সেখান থেকে দু'-একটা শক্ত ব্যাধি ছাড়া যে কিছু সঙ্গে এনেছেন, তা তো কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে না। ছোকরাদের মধ্যে যারা গালগল্পে যোগ দিল, তারা তব, দু'-একটা পাশ দিয়ে এসেছে, বুড়োদের যাঁরা অবজ্ঞা অবহেলা সত্ত্বেও মুখ খুললেন, তাঁদের কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে যে, আর কিছু না হোক তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু এই উজীরদের দল না পারে উড়তে, না পারে সাঁতার কাটতে—চলন যেন ব্যাঙের মত, এলোপাতাড়ি, থপথপ। কাবুলের বহু জিনিস, বহু প্রতিষ্ঠান দেখে মনে দুঃখ হয়, কিন্তু এই মন্ত্রী মণ্ডলীকে দেখে কনফুৎসিয়সের মত বলতে হয়,

'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র, সংসারে প্রণিপাত।'

সইফুল আলম এসে কানে কানে বললেন, 'একটু বাদে দক্ষিণের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন; আমি দোরের গোড়ায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।' দোস্ত মুহম্মদ না শুনেও মাথা নাড়িয়ে প্রকাশ করলেন যে, তিনিও আসছেন।

মজলিস থেকে বেরিয়ে যেন দম ফেলে বাঁচলুম। দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পেঁাছে গিয়েছে, গরগরা শুদম—আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

সত্যিকার বিয়ের মজলিসে তখন প্রবেশ পেলুম। সেখানে দেখি, জনবিশেক ছোকরা, কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ গড়াগড়ি দিয়ে আড্ডা জমাচ্ছে। একজন গামছা দিয়ে গ্রামোফোনটার মুখ গুঁজে সাউন্ড-বক্সের পাশে কান পেতে গান শুনছে। জনতিনেক তাস খেলছে। বিদগ্ধ মোল্লা মীর আসলম এক কোণে কি একখানা বই পড়ছেন। আরেক কোণে এক বুড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন, অথবা ঘুমচ্ছেন —মাথায় প্রকান্ড সাদা পাগড়ি, বরফের মতো সাদা দাড়ি আর কালো মিশমিশে জোব্বা। শান্ত মুখচ্ছবি—একপাশে ছোট একখানা সেতার। সব ছেলে-ছোকরার পাল, ঐ মীর আসলম আর সেতারওয়ালা বৃদ্ধ ছাড়া। মজলিসে আসবাবপত্র কিছু নেই, শুধু দামী গালচে আর রঙীন তাকিয়া।

www.MurchOna.com

কেউ কেউ 'বফরমাইদ, আসতে আজ্ঞা হোক' বলে অভ্যর্থনা করলেন।

আমি দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এখানে সোজা এলেই তো হত।'

তিনি বললেন, 'সেটি হবার জো নেই, আসল মজলিসে বসে নাভিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত এখানে প্রমোশন নদারদ। তা তুমি তো বাপু বেশ চাঁদপানা মুখ করে বসেছিলে। তোমাকে সেখানে উসখুস না করে বসে থাকতে দেখে আমার মনে তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় ভয় জেগেছে। এদেশে উজীর হবার আসল গুণ তোমার আছে—**To sit among bores without being bored.** কিন্তু খবরদার, সাবধানে পা ফেলে চলো দাদা, নইলে রক্ষে নেই—দেখবে একদিন বলা নেই কওয়া নেই ক্যাক করে ধরে নিয়ে উজীর বানিয়ে দিয়েছে।'

সইফুল আলম আমাকে আদর করে বসালেন।

তরুণদের আড্ডা যে উজীরদের মজলিসের চেয়ে অনেক বেশী মনোরঞ্জক তা নয়, তবে এখানে লৌকিকতার তর্জনী নেই বলে যা-খুশী করার অনুমতি আছে। এরা নির্ভয়ে পলিটিক্স পর্যন্ত আলোচনা করে এবং যৌবনের প্রধান ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে কারো মুখে আর কোনো লাগাম থাকে না। কথাবার্তায় ভারতীয় তরুণদের সঙ্গে এদের আসল তফাৎ এই যে, এদের জীবনে নৈরাশ্যের কোনো চিহ্ন নেই, বর্তমান থেকে পালিয়ে গিয়ে অতীতে আশ্রয় তো এরা খোঁজেই না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা আশা-ভরসা, তাও সুপ্লেগড়া পরীস্থান নয়। শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে অচেতন এরকম জোয়ান আমি আর কোথাও দেখিনি। এদেরই একজন আর বসন্তে কি করে ট্রান্সফার হয়ে বদখশান থেকে হিন্দুকুশ পার হয়ে কাবুল এসেছিল তার বর্ণনা দিচ্ছিল। সমস্ত দিন হেঁটে মাত্র তিন মাইল রাস্তা এগোতে পেরেছিল, কারণ একই নদীকে ছ'বার পার হতে হয়েছিল, কিছুটা সাঁতরে, কিছুটা পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে। দুটো খচ্চর ভেসে গেল জলের তোড়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল খাবার-দাবার সবকিছু। দলের সাতজনের মধ্যে দু'জন অনাহারে মারা যান।

এসব বর্ণনা আমি যে জীবনে প্রথম শুনলুম তা নয়, কিন্তু এর বর্ণনাতে কোনো রোমান্স মাখানো ছিল না, পর্যটকদের গতানুগতিক দম্ভ ছিল না আর আফগান সরকারের নিরর্থক অসময়ে ট্র্যান্সফার করার বাতিকের বিরুদ্ধে কণামাত্র নালিশ-ফরিয়াদ ছিল না। ভাবখানা আরেকটা 'ছাতা ছিল না তাই বিষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরলুম। কাল আবার বেরতে পারি দরকার হলে—ছাতা যে সঙ্গে নেবই সে রকম কথাও দিচ্ছিনে।' অর্থাৎ আগামী বসন্তে যদি তাকে ফের বদখশান যেতে হয় তবে সে আপত্তি জানাবে না।

www.MurchOna.com

অথচ যখন বার্লিনে পড়াশুনা করত তখন তিন বছর ধরে মাসে চার শ' মার্ক খর্চা করে আরামে দিন কাটিয়েছে।

অনেক রাতে খাবার ডাক পড়ল। গরম বাঙলাদেশেই যখন বিয়ের রান্না ঠান্ডা হয় তখন ঠান্ডা কাবুলে যে বেশির ভাগ জিনিসই হিম হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

মীর আসলম তাই খানিকটে মাংস এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিঞ্চিৎ শুল্যপক্ক অজমাংস ভক্ষণ কর। আভ্যন্তরিক উষ্মার জন্য ইহাই প্রশস্ততম।'

তারপর দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো জিনিসের অপ্রাচুর্য হয় নাই তো ?' দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পেঁাছে গিয়েছে—গরগরা শুদম—আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

কোনো জিনিসে আকন্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার এই হল ফার্সী সংস্করণ।

আফগান বিয়ের ভোজে যে বিস্তর লোক প্রচুর পরিমাণে খাবে সে কথা কাবুলে না এসেও বলা যায়, কিন্তু তারো চেয়ে বড় তত্ত্বকথা এই যে, যত খাবে তার চেয়ে বেশী ফেলবে, বাঙলাদেশের এই সুসভ্য বর্বরতার সন্ধান আফগানরা এখনো পায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর গালগল্প জমলো ভালো করে। শুধু দোস্ত মুহম্মদ কাউকে কিছু না বলে তিনটে কুশনে মাথা দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বাড়ী ফিরবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আবহাওয়া থেকে অনুমান করলুম যে রেওয়াজ হচ্ছে, হয় মজলিসের পাঁচজনের সঙ্গে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করা, নয় নির্বিকারচিত্তে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়া। বিয়ে বাড়ির হৈ-হল্লা, কড়া বিজলি বাতি আফগানের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।

রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন একজন করে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সইফুল আলম আমাদের আরেক প্রস্থ চা দিয়ে গেলেন। মীর আসলমের ভাষা বিদগ্ধ হতে বিদগ্ধতর হয়ে যখন প্রায় যজ্ঞভস্মের মত পূতপবিত্র হবার উপক্রম করেছে, তখন তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। চেয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ সেতারখানা কোলে তুলে নিয়েছেন।

মীর আসলম আমাকে কানে কানে বললেন, 'তোমার অদৃষ্ট অদ্য রজনীর তৃতীয় যামে সুপ্রসন্ন হইল।'

সমস্ত সন্ধ্যা বৃদ্ধ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। 'পিড়িং' করে প্রথম আওয়াজ বেরতেই মনে হল, এঁর কিন্তু বলবার মত অনেক কিছু আছে।

প্রথম মৃদু টংকারের সঙ্গে সঙ্গেই দোস্ত মুহম্মদও সোজা হয়ে উঠে

www.MurchOna.com

বসলেন—যেন এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় শুয়ে শুয়ে প্রহর গুণছিলেন।

সেতারের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পূর্বেই বুড়ার গলা থেকে গুঞ্জরন ধ্বনি বেরল—কিন্তু ভুল বললুম—গলা থেকে নয়, বুক, কলিজা থেকে, তার প্রতি লোমকূপ ছিন্ন করে যেন সে শব্দ বেরল। সেতার বাঁধা হয়েছিল কোন সন্ধ্যায় জানিনে কিন্তু তাঁর গলার আওয়াজ শুনে মনে হল, এঁর সর্বশরীর যেন আর কোনো ওস্তাদের ওস্তাদ বহুকাল ধরে বেঁধে বেঁধে আজ যামিনীর শেষযামে এই প্রথম পরিপূর্ণতায় পৌঁছালেন।

ওস্তাদী বাজনা নয়—বুড়ার গলা থেকে যে পরী হঠাৎ ডানা মেলে বেরল, সেতারের আওয়াজ যেন তার ছায়া হয়ে গিয়ে তারই নাচে যোগ দিল।

ফার্সী গজল। বুড়ার চোখ বন্ধ; শান্ত-প্রশান্ত মুখচ্ছবি, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপছে না, ওষ্ঠ অধরের মৃদু স্ফুরণের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে গম্ভীর নিষ্কম্প গুঞ্জরন। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আওয়াজ যেন বন্ধনমুক্ত আতরের মত সভাস্থল ভরে দিল।

গানের কথা শুনব কি, সেতারে গলায় মিশে গিয়েছে, যেন সন্ধ্যা বেলাকার নীল আকাশ সূর্যাস্তের লাল আবির মেখে নিয়ে ঘন বেগুনী থেকে আস্তে আস্তে গোলাপীর দিকে এগিয়ে চলেছে। আর পাঁচজনের কথা বলতে পারিনে—এরকমের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। জন্মান্ধ যেন চোখ মেলল সূর্যাস্তের মাঝখানে। আমি তখন রঙের মাঝখানে ডুবে গিয়েছি—সমুদ্র, বেলাভূমি, তরুপল্লব কিছুই চোখে পড়ছে না।

ধ্বনির ইন্দ্রজালে মোহাচ্ছন্ন করে বৃদ্ধ যেন একমাত্র আমারই কানে কানে তাঁর গোপন মন্ত্র পড়তে লাগলেন,

'শবি আগর, শবি আগর, শবি আগর—'

'যদি এক রাত্রের তরে, মাত্র এক রাত্রের তরে, একবারের তরে—'

আমি যেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, 'কি? কি? কি? এক রাতের তরে, একবারের তরে কি?' কিন্তু বলার উপায় নেই—দরকারও নেই, গুণী কি জানেন না?

'আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্'

'প্রিয়ার অধর থেকে একটি চুম্বন পাই'।

প্রথমবার বললেন অতি শান্তকন্ঠে, কিন্তু যেন নৈরাশ্য-ভরা সুরে, তারপর নৈরাশ্য যেন কেটে যেতে লাগল, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল, সাহস বাড়তে লাগল, সবশেষে রইল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাষা, 'পাবোই পাবো, নিশ্চয় পাবো।'

www.MurchOna.com

গুণী গাইছেন 'লবে ইয়ার, 'প্রিয়ার অধর' আর আমার বন্ধ চোখের সামনে কালোর মাঝখানে ফুটে ওঠে টকটকে লাল দুটি ঠোঁট, যখন শুনি 'বোসয়ে তলবম্', 'যদি একটি চুমুন পাই', তখন চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে যায়, বুকের মাঝখানে যেন তখন শুনতে পাই সেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, আতুর হিয়ার আকুলি বিকুলি, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়প্রত্যয়।

হুংকার দিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'জোয়ান শওম।'

'তাহলে আমি জোয়ান হব—একটি মাত্র চুমুন পেলে লুপ্ত যৌবন ফিরে পাব।'

সভাস্থল যেন তান্ডব-নৃত্যে ভরে উঠল—দেখি শংকর যেন তপস্যা শেষে পার্বতীকে নিয়ে উন্মত্ত নৃত্যে মেতে উঠেছেন। হুংকারের পর হুংকার—'জোয়ান শওম', 'জোয়ান শওম।' কোথায় বৃদ্ধ সেতারের ওস্তাদ—দেখি সেই জোয়ান মঙ্গোল। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু'-পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটছে, আর দু'-হাত মেলে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনে ছুঁড়ে কালো বাবরী চুলের আবর্তের ঘূর্ণি লাগিয়েছে।

দেখি তাজমহলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন শাহজাহান আর মমতাজ। হাত ধরাধরি করে। নবীন প্রাণ, নূতন যৌবন ফিরে পেয়েছেন, শতাব্দীর বিচ্ছেদ শেষ হয়েছে।

শুনি সঙ্গীত তরঙ্গের কলকল্লোল জাহ্নবী। সগররাজের সহস্র সন্তান নবীন প্রাণ নবীন যৌবন ফিরে পেয়ে উল্লাসধ্বনি করে উঠেছে।

কিন্তু গুণী, যৌবন পেয়েছে, প্রিয়ার প্রসাদ পেয়েছে, চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে—অথচ কবিতার পদ যে এখনো অগ্রগামী—

'শবি আগর, আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্
আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুমুন যদি পাই
জোয়ান হইব—

তারপর, তারপর কি ?

শুনি অবিচল দৃঢ়কণ্ঠে অদ্ভুত শপথ গ্রহণ,—

'জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম্'

'এই জীবন তাহলে আবার দোহরাতে, দু'বার করতে রাজী আছি। একটি চুমুন দাও, তাহলে আবার সেই অসীম বিরহের তপ্ত দীর্ঘ অন্তবিহীন পথ ক্ষত-বিক্ষত রক্তসিক্ত পদে অতিক্রম করবার শক্তি পাব।

www.MurchOna.com

আসুক না আবার সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদ, তোমার অবহেলার কঠোর কঠিন দাহ !

'আমি প্রস্তুত, আমি শপথ করছি,

—'জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম্ !'

'গোড়া হতে তবে এ-জীবন দোহরাই।'

আমি মনে মনে মাথা নিচু করে বললুম, 'ক্ষমা করো গুণী, ক্ষমা করো কবি। শিখরে পেঁাছে উদ্ধত প্রশ্ন করেছিলুম, পদ এখনো অগ্রগামী, যাবো কোথায়। তুমি যে আমাকে হঠাৎ সেখান থেকে শূন্যে তুলে নিতে পারো, তোমার গানের পরী যে আমাকেও নীলামবরের মর্মমাঝে উধাও করে নিয়ে যেতে পারে, তার কল্পনাও যে করতে পারিনি।'

বারে বারে ঘুরে ফিরে গুণীর আকুতি-কাকুতি 'শবি আগর', 'যদি এক রাতের তরে' আর সেই দৃঢ় শপথ 'জিন্দেগী দুবারা কুনম্', 'এ-জীবন দোহরাই'—গানের বাদবাকী এই দুই বাক্যেই বারে বারে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে সবপ্রকাশ হচ্ছে। কখনো শুনি 'শবি আগর' কখনো শুধু 'দুবারা কুনম্'—'শবি আগর,' দুবারা কুনম।'

পশ্চিমের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও পূবের আকাশ অনেকক্ষণ ধরে লাল রঙ ছাড়ে না—কখন গান বন্ধ হয়েছিল বলতে পারিনে। হঠাৎ ভোরের আজান কানে গেল, 'আল্লাহু আকবর,' 'খুদাতালা মহান' মাভৈ, মাভৈ, ভয় নেই, ভয় নেই, তোমার সব কামনা পূর্ণ হবে।

'ওয়া লাল আখিরাতু খাইরুন লাকা মিনাল্ উলা'

'অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবে তো ভবিষ্যৎ।' *

চোখ মেলে দেখি কবি নেই। মোল্লা মীর আসলম পাথরের মত বসে আছেন, আর দোস্ত মুহম্মদ দু'-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছেন।

বিশ

দরজা খাঁ খাঁ করছে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। আসবাবপত্র সব অন্তর্ধান। কার্পেটের উপর অ্যাটাচিকেসে মাথা রেখে দোস্ত মুহম্মদ শুয়ে। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, 'বোরো, গুমশো'—'বেরিয়ে যা, পালা এখান থেকে।'

দোস্ত মুহম্মদের রকমারি অভ্যর্থনা সম্ভাষণে ততদিন আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কাছে গিয়ে বললুম, 'জিনিসপত্র সব কি হল ? আগা

* কুরআন শরীফ ৯৩, ৪।

www.MurchOna.com

আহমদ যে ভারী ভারী টেবিল চেয়ার, কোচ সোফা পর্যন্ত সরাবে ততটা আঁচ করতে পারিনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বিড়বিড় করে বললেন, 'সব ব্যাটা চোর, সব শালা চোর, কোনো ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই, কাবুল থেকে প্যারিস পর্যন্ত।'

আমি বললুম, 'বড় অন্যায় কথা। চুরি করল আগা আহমদ, দোষ ছড়ালো প্যারিস পর্যন্ত।'

বললেন, 'কী মুশকিল, আগা আহমদ চুরি করলে তার পিছনে আমি রাইফেল কাঁধে করে বেরতুম না? না বেরলে আফ্রিদী সমাজে আমার জাত-ইজ্জত থাকত? নিয়েছে ব্যাটা লাফোঁ?'

'সে আবার কে?'

'পর্শু এসে পেঁচেছে, ফরাসীর অধ্যাপক। লব্-ই-দরিয়ায় বাসা বেঁধেছে—বেশ বাড়িখানা। আফগান সরকারের যত আধিখ্যেতা-আত্তি সব বিদেশীদের জন্য।'

আমি বললুম, 'চোর কে, তার সাকিন-ঠিকানা সব যখন জানেন তখন মাল উদ্ধার--'

বললেন, 'আইনে দেয় না—বেচারী দুঃখ করছিল কোথাও আসবাবপত্র পাচ্ছে না। আমি বললুম, আমার বাড়িতে বিস্তর আছে—ফরাসী জানো তো, বুক দ্য ম্যোবল, ফুল দ্য ম্যোবল, তা দ্য ম্যোবল, ব্যাটাকে দেখিয়ে দিলুম 'বিস্তর মাল' কত বিচিত্র কায়দায় ফরাসীতে বলা যায়। শুনে ব্যাটা দুসরা আফগান লড়াইয়ের গোরা সেপাইয়ের মত কচুকাটা হয়ে শুয়ে পড়ল।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'শুয়ে পড়ল কোথায়, এসে তো দিব্যি সব কিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল।'

দোস্ত মুহম্মদ আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'তওবা তওবা, নিজে এলে কি আর সব নিয়ে যেত—দেখত না ভিটেতে কবুতর চরার মত অবস্থা হয়ে উঠেছে। আমিই সব পাঠিয়ে দিলুম।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বেশ করেছ, এখন মরো হিমে শুয়ে—'

এক লাফ দিয়ে দোস্ত মুহম্মদ আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বলিনি বলিনি, তখন বলিনি, পারবিনি রে, পারবিনি—তোকে 'আপনি' বলা ছাড়তেই হবে। কিন্তু তুই ভাই রেকর্ড ব্রেক করেছিস—ঝাড়া পনরো দিন 'আপনি' চালিয়েছিস।'

আমি বললুম, 'বেশ বেশ। কিন্তু সেচ্ছায় যখন সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছ তখন দুনিয়াসুদ্ধ লোককে 'চোর চামার' বলে কটু-কাটব্য করছিলে কেন?'

www.MurchOna.com

'কাউকে বলবিনে, শুনেই ভুলে যাবি ? তবে বলি শোন। তুই যখন ঘরে ঢুকলি তখন দেখলুম তোর মুখ বড্ড ভার। হয়ত দেশের কথা ভাবছিলি, নয় কাল রাত্তিরের গানের খোয়ারি কাটিয়ে উঠতে পারিসনে—কেন যে ক্ষ্যাপারা এরকম ভুতুড়ে গান গায় ? তা সে যাক্‌গে। কিন্তু তোর মুখ দেখে মনে হল তুই বড্ড বেজার। তাই যা-তা সব বানিয়ে, তোকে চটিয়ে সব কথা ভুলিয়ে দিলুম। দেখলি কায়দাখানা।'

আমি বললুম, 'খুব দেখলুম, আমাকে বেকুব বানালে। তোমাকে বেকুব বানায় আগা আহমদ, আর তুমি বেকুব বানালে আমাকে। তা নূতন কিছু নয়—আমাদের দেশে একটা দোহা আছে—

শমনদমন রাবণ আর রাবণদমন রাম,
শ্বশুরদমন শাশুড়ী আর শাশুড়ীদমন হাম্‌।

ঢিলে গল্প, কাঁচা রসিকতা। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদ নবীনের মত, 'যাহা পায় তাহাই খায়,' মুখে হাসি লেগেই আছে।

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু একটা খাট তো অন্তত কেনো, মাটিতে শোবে নাকি ?'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তবে আসল কথাটা এই বেলা শোনো; বিলিতী আসবাবপত্রে আমি কখনো আরাম বোধ করিনি—দশ বৎসর চেষ্টা করার পরও। অথচ পয়সা দিয়ে কিনেছি, ফেলতে গেলে লাগে। এতদিনে যখন সুযোগ মিলল তখন নূতন করে জঞ্জাল জুটোব কেন ? এইবার আরাম করে পাঠানী কায়দায় ঘরময় মই চষে বেড়াব—খাট থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙবার আর ভয় নেই।'

আমি বললুম, 'কর্মরত ন শিকনদ,' তোমার কোমর ভেঙে দু' টুকরো না হোক।'

কথা ছিল দু'জনে একসঙ্গে বগদানফ সায়েবের বাড়ি যাব।

পূর্বেই বলেছি ফরাসী দূতাবাসে বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানা ছিল বিদেশী মহলের কেন্দ্রভূমি। বাগান থেকেই শব্দ শুনে তার আভাস পেলুম। ঘরে ঢুকে দেখি একপাল সায়েব মেম।

আমাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বগদানফ সায়েব চোস্ত ফরাসী ভাষায় দুরুস্ত ফরাসী কায়দায় বললেন, 'পেরমেতে মওয়া ল্য প্লেজির দ্য ভু প্রেজাঁতে—অনুমতি যদি দেন তবে আপনাদের সামনে অমুককে নিবেদন করে বিমলানন্দ উপভোগ করি।'

তারপর এক-একজন করে সকলের নাম বলে যেতে লাগলেন। আমি বলি, 'হাডুডু', তাঁদের কেউ বলেন, 'আঁশাতে', কেউ বলেন, 'শার্মে,' কেউ বলেন, 'রাভি।' অর্থাৎ আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেউ হয়েছেন

www.MurchOna.com

enchanted, কেউ charmed কেউ বা ravished ! একেই বলে ফরাসী ভদ্রতা। এঁরা যখন গ্রেতা গার্বো বা মার্লেনে দীতরিশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি সত্যি enchanted হন তখন কি বলেন তার সন্ধান এখনো পাইনি।

মসিয়ো লাফোঁ গল্পের ছেঁড়া সুতোর খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'তারপর বাদশা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসী শিখতে ছ'মাসের বেশী সময় লাগার কথা নয়।' আমি বললুম, 'না হুজুর, অন্তত দু'বছর লাগার কথা'।'

বগদানফ সায়েব বললেন, 'করেছেন কি ? বাদশাহের কোনো কথায় না বলতে আছে ? দিবা দ্বিপ্রহরে, প্রখর রৌদ্রালোকে যদি হুজুর বলেন 'পশ্য, পশ্য, নীলাম্বরের ললাটদেশে চন্দ্রমা কি প্রকারে শ্বেতচন্দন প্রলেপ করেছেন।' আপনি তখন প্রথম বললেন, হুজুরের যে পূতপবিত্র পদদ্বয় অনাদি কাল থেকে অসীম কাল পর্যন্ত মণিমাণিক্য বিজড়িত সিংহাসনে বিরাজমান এ-গোলাম সেই পদরজস্পর্শ লাভের আশায় কুরবানী হতে প্রস্তুত।' তারপর বলবেন—'

বাধা দিয়ে মাদাম লাফোঁ বললেন, 'সম্পূর্ণ মন্ত্রোচ্চারণে যদি ভুলচুক হয়ে যায় ? দৈর্ঘ্য তো কিছু কম নয়।'

বগদানফ সায়েব সদয় হাসি হেসে বললেন, 'অল্প-স্বল্প রদবদল হলে আপত্তি নেই। 'মণি-মাণিক্যের' বদলে 'হীরা-জওহর' বলতে পারেন, 'পদরজের' পরিবর্তে 'পদধূলি' বললেও বাধবে না।

'তারপর বলবেন, 'হুজুরের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,—চন্দ্রমা কি সত্যই অপূর্ব বেশ ধারণ করেছেন এবং নক্ষত্রমন্ডলী কতই না নয়নাভিরাম।'

ইতালির সিন্যোরা দিগাদো জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি ভদ্রতা বজায় রেখে হুজুরকে সত্যি কথা জানাবার কোনো উপায়ই নেই ? এই মনে করুন মসিয়ো লাফোঁ যদি সত্যি সত্যি জানতে চান যে, ফরাসী শিখতে দু'বছর লাগে ?'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে, বাদশা যখন বলবেন ছ'মাস আপনি তখন বলবেন, 'নিশ্চয়ই, হুজুর, ছ'মাসেই হয়। দু'বছরে আরো ভালো হয়।' হুজুরেরও তো কান্ডজ্ঞান আছে। আপনার ভদ্রতাসৌজন্যের আতর তিনি শুঁকবেন, গায়ে মাখবেন, তাই বলে তো আর গিলবেন না।'

মসিয়ো লাফোঁ বললেন, 'এসব বাড়াবাড়ি।'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই; বাড়াবাড়িরই আরেক নাম superfluity। আর পোয়েট টেগোর—আমাদের তিনি গুরুদেব—' বলেই তিনি প্রোফেসর বেনওয়া ও আমার দিকে একবার বাও করলেন—'তিনি বলেন, 'আর্টের

www.MurchOna.com

সৃষ্টি হয়েছে সুপারফ্লুয়িটি থেকে।' আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা বোঝাতে গিয়ে তিনি শাস্ত্রী মশায়কে কি একটা চমৎকার তুলনা দিয়েছিলেন না ?'

আমি বললুম, 'কাঠের ডান্ডা লাগানো টিনের কেনেস্তারায় করে রাধা মালীর নাইবার জল আনার মধ্যে আর নন্দলাল কর্তৃক চিত্র বিচিত্রিত মৃৎপাত্র ভরে ষোড়শী তন্বঙ্গী সুন্দরীর জল আনার মধ্যে যে সুপার-ফ্লুয়িটির তফাত তাই আর্ট।'

বগদানফ সায়েব উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'শুধু আর্ট ? দর্শন, বিজ্ঞান, সব কিছু—কলচর বলতে যা কিছু বুঝি। সবই সুপারফ্লুয়িটি থেকে, বাড়াবাড়ি থেকে।'

অধ্যাপক ভ্যাসাঁ বললেন, 'কিন্তু এই কলচর যখন চরমে পেঁছিয় তখন গুরুচন্ডালে এত পার্থক্য হয়ে যায় যে, বাইরের শত্রু এসে যখন আক্রমণ করে তখন সে দেশের সব শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে স্বাধীনতা হারায়। যেমন ইরান।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষ।'

পোলিশ মহিলা মাদাম ভরভচিয়েভিচ বললেন, 'কিন্তু ইংরেজ ? তারা তো সভ্য, তাদের গুরুচন্ডালেও তফাত অনেক, কিন্তু তারা তো সব সময় এক হয়ে লড়তে পারে।'

বগদানফ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাদের কথা বললেন, মাদাম ?'

ইংরেজের।'

'ঐ যারা ইয়োরোপের পশ্চিমে একটা ছোট দ্বীপে থাকে ?'

মজলিসে ইংরেজ কেউ ছিল না। সবাই ভারি খুশী। আমি মনে মনে বললুম, 'আমাদের দেশেও বলে 'চরুয়া।'

অধ্যাপক ভ্যাসাঁ বললেন, 'বগদানফ ঠিকই অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের ভিতর অনেক খানদানী বংশ আছে সত্যি কিন্তু গুরুচন্ডালে যে বৈদগ্ধ্যের পার্থক্য হবে, সে কোথায় ? ওদের তো থাকার মধ্যে আছে এক সাহিত্য। সঙ্গীত নেই, চিত্রকলা নেই, ভাস্কর্য নেই, স্থাপত্য নেই। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে পার্থক্য হবে তার অনুভূতিগত উপকরণ কোথায় ? অথচ ফ্রান্সে এসব উপকরণ প্রচুর ; তাই দেখুন ফরাসীরা এক হয়ে লড়তে জানে না, শান্তির সময় রাজ্য পর্যন্ত চালাতে পারে না। যে দেশে আছি তার নিন্দে করতে নেই, কিন্তু দেখুন, এক ফোঁটা দেশ অথচ স্বাধীন।'

মাদাম ভরভচিয়েভিচ বললেন, 'এ দেশেও তো মোল্লা আছে।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, কিছু ভয় নেই মাদাম। মোল্লাদের আমি বিলক্ষণ চিনি। ওদের বেশীর ভাগ যেটুকু শাস্ত্র জানে আপনাকে সেটুক,

www.MurchOna.com

আমি তিন দিনেই শিখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু মেয়েদের মোল্লা হওয়ার রেওয়াজ নেই।'

মাদাম চটে গিয়ে বললেন, 'কেন নেই ?'

দোস্ত মুহম্মদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাড়ি গজায় না বলে।'

ভ্যাসাঁ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মোল্লাই হন আর যাই হন, এ দেশের মেয়ে হয়ে জন্মালে যে আপনাকে বোরকার আড়ালে থাকতে হত। আমাদের ক্ষেতিটা বিবেচনা করুন।'

সবাই একবাক্যে

'Oui, Madame,

Si, si, Madame,

Certainment, Madame.'

কোরাস সমাপ্ত হলে দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিন্তু পর্দা-প্রথা ভালো।'

যেন আটখানা অদৃশ্য তলোয়ার খোলার শব্দ শুনতে পেলুম; চোখ বন্ধ করে দেখি দোস্ত মুহম্মদের মুণ্ডুটা গড়িয়ে গড়িয়ে আফ্রিদী মুল্লুকের দিকে চলেছে।

নাঃ! কল্পনা। শুনি দোস্ত মুহম্মদ বলছেন, 'ধর্মত বলুন তো মশায়রা, মাদাম ভরভচিয়েভচি, মাদাম লাফোঁ, সিন্নোরা দিগাদোর মত সুন্দরী সংসারে কয়টি ? বেশীর ভাগই তো কুচ্ছিত। পাইকারী পর্দা চালালে তাহলে ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশী নয় কি ?

মহিলারা কথঞ্চিৎ শান্ত হলেন।

কিন্তু মাদাম ভরভচিয়েভচি পোলিশ,—উষ্ণ রক্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর পুরুষদের সবাই বুঝি খাপসুরত এ্যাডনিস ? তারাই বা বোরকা পরে না কেন, শুনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তাই তো পুরুষদের দিকে মেয়েদের তাকানো বারণ।'

মজলিসে হট্টগোল পড়ে গেল। মেয়েরা খুশী হলেন, না বেজার হলেন ঠিক বোঝা গেল না। কুয়াশা কাটিয়ে সিন্নোরা দিগাদো দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরীর অপ্রাচুর্য বলেই কি আপনি বিয়ে করেননি ?'

দোস্ত মুহম্মদ একটুখানি হাঁ করে বা হাত দিয়ে ডান দিকের গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তা নয়। আসল কথা হচ্ছে, কোনো একটি সুন্দরীকে বেছে নিয়ে যদি তাকে বিয়ে করি তবে তার মানে কি এই নয় যে, আমার মতে দুনিয়ার আর সব মেয়ে তার তুলনায় কুচ্ছিত। একটি সুন্দরীর জন্য দুনিয়ার সব মেয়েকে এ রকম বে-ইজ্জৎ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

www.MurchOna.com

সবাই খুশী। আমি বিশেষ করে। পাহাড়ী আফগান বিদগ্ধ ভ্যাসাঁকে শিভালরিতে ঘায়েল করে দিল বলে।

ইরানী রাজদূতাবাসের আগা আদিব এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, বললেন, 'তবেই আফগানিস্থানের হয়েছে। ইরানী কায়দার নকল করে আফগানিস্থানেরও কপাল ভাঙবে। ইরান কিন্তু ইতিমধ্যে হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে। শাহ-বাদশাহের সঙ্গে কথা বলবার যে সব কায়দা বগদানফ সায়েব বললেন সেগুলো তিনি দশ বছর আগে ইরানে শিখেছিলেন। এখন আর সেদিন নেই। সব রকম এটিকেটের বিরুদ্ধে সেখানে এখন জোর আন্দোলন আর ঠাট্টামস্করা চলছে। ঘরে ঢোকার সময় যে সামান্য ভদ্রতা একে অন্যকে দেখায় তার বিরুদ্ধে পর্যন্ত এখন কবিতা লেখা হয়। শুনে শুনে একটা তো আমারই মুখস্থ হয়ে গিয়েছে ; আপনারা শোনেন তো বলি।'

সবাই উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন।

আগা আদিব বেশ রসিয়ে রসিয়ে আবৃত্তি করে গেলেন—

'খুদা তুমি দিলে বহুৎ জ্ঞান,
শেষ রহস্য এই বারেতে কর সমাধান।
ইরান দেশের লোক
কসম খেয়ে বলতে পারি নয় এরা উজবোক্।
বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, সাহস আছে ঢের
সিঙি লড়ে, মোকাবেলা করে ইংরেজের।
তবে কেন ঢুকতে গেলেই ঘরে
সবাই এমন ঠেলাঠেলি করে ?
দোরের গোড়ায় থমকে দাঁড়ায় ভিতর পানে চায়,
'আপনি চলুন', 'আপনি ঢুকুন', দাঁড়িয়ে কিন্তু ঠায়।
হাসি-খুশী বন্ধ হঠাৎ গল্প যে যায় থেমে
ঠেলাঠেলির মধ্যিখানে উঠছে সবাই ঘেমে।
অবাক হয়ে ভাবি সবাই কেন এমন করে,
দিবা-দ্বিপ্রহরে
কি করে হয় ঘরের মাঝে ভূত ?
তবে কি যমদূত ?
সলমনের জিন্ ?
কিম্বা গিলটিন ?
ঢুকলে পরেই কপাৎ করে কেটে দেবে গলা,
তাই দেখে কি দোরে এসে বন্ধ সবার চলা ?'

www.MurchOna.com

একুশ

কাবুলের রাস্তাঘাট, বাজারহাট, উজীরনাজির, গুরুচন্ডালের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল বটে, কিন্তু গোটা দেশের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার আশা দেখলুম কম, আর নগর জনপদ উভয় ক্ষেত্রে যে-সব অদৃশ্য শক্তি শান্তির সময় মন্দ গতিতে এবং বিদ্রোহবিপ্লবের সময় দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে সেগুলোর তাল ধরা বুঝলুম আরো শক্ত, প্রায় অসম্ভব।

আফগানিস্থানের মেরুদন্ড তৈরী হয়েছে জনপদবাসী আফগান উপ-জাতিদের নিয়ে, অথচ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা, আভ্যন্তরীণ শাসন-প্রণালী, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো কেতাব লেখা হয়নি; কাবুলে এমন কোনো গুণীরও সন্ধান পাইনি যিনি সে সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করুন আর নাই করুন অন্তত একটা মোটামুটি বর্ণনাও দিতে পারেন। ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কাবুলীরা প্রায়ই বলেন, 'তারপর শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করল', কিন্তু যদি তখন প্রশ্ন করেন, বিদ্রোহ করল কেন, তবে উত্তর পাবেন, 'মোল্লারা তাদের খ্যাপালো বলে', কিন্তু তারপরও যদি প্রশ্ন শুধান যে, উপজাতিদের ভিতরে এমন কোন্ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উষ্ণ বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল যে, মোল্লাদের ফুলকি দেশময় আগুন ধরাতে পারল, তাহলে আর কোনো উত্তর পাবেন না। মাত্র একজন লোক—তিনিও ভারতীয়—আমাকে বলেছিলেন, 'মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, বিদেশের পণ্য-বাহিনীকে লুটতরাজ না করলে গরীব আফগানের চলে না বলে সভ্যদেশের ট্রেড-সাইক্লের মত তাদেরও বিপ্লব আর শান্তির চড়াই-ওতরাই নিয়ে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়।'

গ্রামের অবস্থা যেটুকু শুনতে পেলুম তার থেকে মনে হল শান্তির সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে শহরবাসীর মাত্র এইটুকু যোগাযোগ যে, গ্রামের লোক শহরে এসে তাদের ফসল, তরকারি, দুম্বা, ভেড়া বিক্রয় করে সস্তা দরে, আর সামান্য যে দু'-একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য না কিনলেই নয়, তাই কেনে আক্রা-দরে। সভ্যদেশের শহরবাসীরা বাদবাকীর বদলে গ্রামের জন্য ইস্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট বানিয়ে দেয়। কাবুলের গ্রামে সরকারী কোনো প্রতিষ্ঠান নেই বললেই হয়। কতকগুলো ছেলে সকালবেলা গাঁয়ের মসজিদে জড়ো হয়ে গলা ফাটিয়ে আমপারা (কোরানের শেষ অধ্যায়) মুখস্থ করে—এই হল বিদ্যাচর্চা। তাদের তদারক করনেওয়ালা মোল্লাই গাঁয়ের ডাক্তার। অসুখ-বিসুখে তাবিজ-কবচ তিনিই লিখে

www.MurchOna.com

দেন। ব্যামো শক্ত হলে পানি-পড়ার বন্দোবস্ত, আর মরে গেলে তিনিই তাকে নাইয়ে ধুইয়ে গোর দেন। মোল্লাকে পোষে গাঁয়ের লোক।

খাজনা দিয়ে তার বদলে আফগান গ্রাম যখন কিছুই ফেরত পায় না তখন যে সে বড় অনিচ্ছায় সরকারকে টাকাটা দেয় এ কথাটা সকলেই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

দেশময় অশান্তি হলে আফগান-গাঁয়ের সিকি পয়সার ক্ষতি হয় না—বরঞ্চ তার লাভ। রাইফেল কাঁধে করে জোয়ানরা তখন লুটে বেরোয়—'বিধিদত্ত' আফগানিস্থানের অশান্তিও বিধিদত্ত, সেই হিড়িকে দু'পয়সা কামাতে আপত্তি কি? ফ্রান্স-জর্মনিতে লড়াই লাগলে যে রকম জর্মনরা মার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, 'নাখ্ পারিজ, নাখ্ পারিজ', 'প্যারিস চলো, প্যারিস চলো', আফগানরা তেমনি বলে, 'বিআ ব কাবুল, ব রওম্ ব 'কাবুল', 'কাবুল চলো, কাবুল চলো।'

শহরে বসে আছেন বাদশা। তাঁর প্রধান কর্ম আফগান উপজাতির লুন্ঠনলিপ্সাকে দমন করে রাখা। তার জন্য সৈন্য দরকার, সৈন্যকে মাইনে দিতে হয়, গোলাগুলীর খর্চা তো আছেই। শহরের লোক তার খানিকটা যোগায় বটে কিন্তু মোটা টাকাটা আসে গাঁ থেকে।

তাই এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হয়। খাজনা তোলার জন্য সেপাই দরকার, সেপাই পোষার জন্য খাজনার দরকার। এ-চক্র যিনি ভেদ করতে পারেন তিনিই যোগীবর, তিনিই আফগানিস্থানের বাদশা। তিনিই মহাপুরুষ সন্দেহ নেই; যে আফগানের দাঁতের গোড়া ভাঙবার জন্য তিনি শিলনোড়া কিনতে চান সেই আফগানের কাছ থেকেই তিনি সে পয়সা আদায় করে নেন।

ঘানি থেকে যে তেল বেরোয়, ঘানি সচল রাখার জন্য সেটুকু ঐ ঘানিতেই ঢেলে দিতে হয়।

সামান্য যেটুকু বাঁচে তাই দিয়ে কাবুল শহরের জৌলুশ।

কিন্তু সে এতই কম যে, তা দিয়ে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তোলা যায় না, শিক্ষাদীক্ষার জন্য ব্যাপক কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায় না। কাজেই কাবুলে শিক্ষিত সম্প্রদায় নেই বললেও চলে।

কিন্তু তাই বলে কাবুল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বর্বর একথা বলা ভুল। কাবুলের মোল্লা সম্প্রদায় ভারতবর্ষ-আফগানিস্থানের যোগাযোগের ভগ্নাবশেষ।

কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়।

কাবুলের দরবারী ভাষা ফার্সী, কাজেই সাধারণ বিদেশীর মনে এই

www.MurchOna.com

বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক যে, কাবুলের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক ইরানের সঙ্গে। কিন্তু ইরান শীয়া মতবাদের অনুরাগী হয়ে পড়ায় সুন্নী আফগানিস্থান শিক্ষাদীক্ষা পাওয়ার জন্য ইরান যাওয়া বন্ধ করে দিল। অথচ দেশ গরীব, আপন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মত সামর্থ্যও তার কোনো কালে ছিল না।

এদিকে পাঠান, বিশেষ করে মোগল যুগে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দিল্লী লাহোরে ইসলাম ধর্মের সুন্নী শাখার নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। শিক্ষাদানের মাধ্যম ফার্সী; কাজেই দলে দলে কাবুল কান্দাহারের ধর্ম-পিপাসু ছাত্র ভারতবর্ষে এসে এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; পূর্ববর্তী যুগে কাবুলীরা বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য তক্ষশিলায় আসত—আফগানিস্থানে যে সব প্রাচীন প্রাচীর-চিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো অজন্তার ঐতিহ্যে আঁকা, চীন বা ইরানের প্রভাব তাতে নগণ্য।

এই ঐতিহ্য এখনো লোপ পায়নি। কাবুলের উচ্চশিক্ষিত মৌলবী-মাত্রই ভারতে শিক্ষিত ও যদিও ছাত্রাবস্থায় ফার্সীর মাধ্যমে এদেশে জ্ঞান-চর্চা করে গিয়েছেন, তবু সঙ্গে সঙ্গে দেশজ উর্দু ভাষাও শিখে নিয়ে গিয়েছেন। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের উপর এঁদের প্রভাব অসীম এবং গ্রামের মোল্লাই আফগান জাতির দৈনন্দিন জীবনের চক্রবর্তী।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত জগৎ ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ। এঁরা নাকি সর্বপ্রকার প্রগতির শত্রু, এঁদের দৃষ্টি নাকি সব সময় অতীতের দিকে ফেরানো এবং সে অতীতও নাকি মানুষের সুখদুঃখে মেশানো, পতন-অভ্যুদয়ে গড়া অতীত নয়, সে অতীত নাকি আকাশ-কুসুমজাত সত্যযুগের শাস্ত্রীয় অচলায়তনের অন্ধ প্রাচীর নিরুদ্ধ।

তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের পুস্তক লিখতে বসিনি, কাজেই পৃথিবীর সর্ব ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়। কিন্তু আফগান মোল্লার একটি সাফাই না গাইলে অন্যায় করা হবে।

সে-সাফাই তুলনা দিয়ে পেশ করলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কর্ণধার ছিলেন মৌলবী-মোল্লা, শাস্ত্রী-ভটচায। কিন্তু এঁরা দেশের লোককে উত্তেজিত করে ইংরেজের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেননি অথচ আফগান মোল্লার কট্টর দুশমনও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ইংরেজকে তিন-তিনবার আফগানিস্থান থেকে কান ধরে বের করবার জন্য প্রধানত দায়ী আফগান মোল্লা।

আহা, আহা! এরপর আর কি বলা যেতে পারে আমি তো ভেবেই

www.MurchOna.com

পাই না। এরপর আর আফগান মোল্লার কোন্ দোষ ক্ষমা না করে থাকা যায় ? কমজোর কলম আফগান মোল্লার তারিফ গাইবার মত ভাষা খুঁজে পায় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছেন এমন লোক আফগানিস্থানে দু'ডজন হবেন কিনা সন্দেহ। দেশে যখন শান্তি থাকে তখন এঁদের দেখে মনে হয়, এঁরাই বুঝি সমস্ত দেশটা চালাচ্ছেন; অশান্তি দেখা গেলেই এঁদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁদের সঙ্গে আলাপচারি হল; দেখলুম প্যারিসে তিন বৎসর কাটিয়ে এসে এঁরা মার্সেল প্রুস্ত্, আঁদ্রে জিদের বই পড়েননি, বার্লিন-ফের্তা ড্যুরারের নাম শোনেননি, রিলকের কবিতা পড়েননি। মিল্ট্ন বাল্মীকি মিলিয়ে মধুসূধন যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তারই মত গ্যোটে ফিরদৌসী মিলিয়ে কাব্য রচনা করার মত লোক কাবুলে জন্মাতে এখনো ঢের বাকী।

তাহলে দাঁড়ালো এই ঃ—বিদেশফের্তাদের জ্ঞান পল্লবগ্রাহী, এবং দেশের নাড়ীর সঙ্গে এদের যোগ নেই। মোল্লাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত,—যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের সাতখুন মাফ করলেও প্রশ্ন থেকে যায়,—ইংরেজ রুশকে ঠেকিয়ে রাখাই কি আফগানিস্থানের চরম মোক্ষ ? দেশের ধনদৌলত বাড়িয়ে শিক্ষাসভ্যতার জন্য যে প্রচেষ্টা, যে আন্দোলনের প্রয়োজন মৌলবী-সম্প্রদায় কি কোনদিন তার অনুপ্রেরণা যোগাতে পারবেন ? মনে তো হয় না। তবে কি বাধা দেবেন ? বলা যায় না।

পৃথিবীর সব জাত বিশ্বাস করে যে, তার মত ভুবনবরেণ্য জাত আর দুটো নেই; গরীব জাতের তার উপর আরেকটা বিশ্বাস যে, তার দেশের মাটি খুঁড়লে সোনা রুপো তেল যা বেরবে তার জোরে সে বাকী দুনিয়া, ইস্তেক চন্দ্রসূর্য কিনে ফেলতে পারবে। নিরপেক্ষ বিচারে জোর করে কিছু বলা শক্ত কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি কিছু না বেরোয় তবে আফগানিস্থানের পক্ষে ধনী হয়ে শিক্ষাদীক্ষা বিস্তার করার অন্য কোনো সামর্থ্য নেই।

সত্যযুগে মহাপুরুষরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, কলিযুগে গণৎকাররা করে। পাকাপাকি ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহস আমার নেই তবু অনুমান করি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে শক্তিশালী হওয়া মাত্র আবার আফগানিস্থান ভারতবর্ষে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কাবুল কান্দাহারের বিদ্যার্থীরা আবার লাহোর দিল্লীতে পড়াশুনা করতে আসবে।

প্রমাণ ? প্রমাণ আর কি ? প্যারিস-বাসিন্দা ইংরিজী বলে না, ভিয়েনার লোক ফরাসী বলে না, কিন্তু বুডাপেস্টের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনো জর্মন বলেন, জ্ঞানান্বেষণে এখনো ভিয়েনা যান—ভিন্ন রাষ্ট্র নির্মিত হলেই তো আর ঐতিহ্য সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেলা

www.MurchOna.com

যায় না। কাবুলের মৌলবী-সম্প্রদায় এখনো উর্দু বলেন, ভারতবর্ষ বর্জন করে এঁদের উপায় নেই। ঝগড়া যদি করেন তবে সে তিনদিনের তরে।

উর্দু যে এদেশে একদিন কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পেলুম হাতেনাতে।

বাইশ

আগেই বলেছি, আমার বাসা ছিল কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে—সেখান থেকে আরো মাইল দুই দূরে নূতন শহরের পত্তন হচ্ছিল। সেখানে যাবার চওড়া রাস্তা আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। অনেক পয়সা খরচা করে অতি যত্নে তৈরী রাস্তা। দু'দিকে সারি-বাঁধা সাইপ্রেস গাছ, স্বচ্ছ জলের নালা, পায়ে চলার আলাদা পথ, ঘোড়সোয়ার-দের জন্যও পৃথক বন্দোবস্ত।

এ রাস্তা কাবুলীদের বুলভার। বিকেল হতে না হতেই মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, বাইসিকেল, ঘোড়া চড়ে বিস্তর লোক এ রাস্তা ধরে নূতন শহরে হাওয়া খেতে যায়। হেঁটে বেড়ানো কাবুলীরা পছন্দ করে না। প্রথম বিদেশী ডাক্তার যখন এক কাবুলী রোগীকে হজমের জন্য বেড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন তখন কাবুলী নাকি প্রশ্ন করেছিল যে, পায়ের পেশীকে হায়রান করে পেটের অন্ন হজম হবে কি করে?

বিকেলবেলা কাবুল না গেলে আমি সাইপ্রেস সারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে পায়চারি করতুম। এসব জায়গা সন্ধ্যার পর নিরাপদ নয় বলে রাস্তায় লোক চলাচল তখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।

এক সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরছি তখন একখানা দামী মোটর ঠিক আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। স্টিয়ারিঙে এক বিরাট বপু কাবুলী ভদ্রলোক, তাঁর পাশে মেমসায়েবের পোশাকে এক ভদ্রমহিলা—হ্যাটের সামনে ঝুলানো পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে যেটুকু দেখা গেল তার থেকে অনুমান করলুম, ভদ্রমহিলা সাধারণ সুন্দরী নন।

নমস্কার অভিবাদন কিছু না, ভদ্রলোক সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফার্সী বলতে পারেন?'

আমি বললুম, 'অল্প-স্বল্প।'

'দেশ কোথায়?'

'হিন্দুস্থান।'

www.MurchOna.com

তখন ফার্সী ছেড়ে ভদ্রলোক ভুল উর্দুতে, কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রায়ই আপনাকে অবেলায় এখানে দেখতে পাই। আপনি বিদেশী বলে হয়ত জানেন না যে, এ জায়গায় সন্ধ্যার পর চলাফেরা করাতে বিপদ আছে।'

আমি বললুম, 'আমার বাসা কাছেই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি করে হয়? এখানে তো অজ পাড়াগাঁ—চাষাভুষোরা থাকে।'

আমি বললুম, 'বাদশা এখানে কৃষিবিভাগ খুলেছেন—আমরা জন-তিনেক বিদেশী এক সঙ্গে এখানেই থাকি।'

আমার কথা ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ফার্সীতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি হাঁ, না, কিছুই বলছিলেন না।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাবুল শহরে দোস্ত-আশনা নেই? একা একা বেড়ানোতে দিল হায়রান হয় না? আমার বিবি বলছিলেন, 'বাচ্চা গম্ মীখুরদ—ছেলেটার মনে সুখ নেই।' তাইতে আপনার সঙ্গে আলাপ করলুম।' বুঝলুম, ভদ্রমহিলার সৌন্দর্য মাতৃত্বের সৌন্দর্য। নিচু হয়ে আদাবতসলিমাত জানালুম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেনিস খেলতে পারেন?'

'হাঁ।'

'তবে কাবুলে এলেই আমার সঙ্গে টেনিস খেলে যাবেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক ধন্যবাদ—কিন্তু আপনার কোর্ট কোথায়, আপনার পরিচয়ও তো পেলুম না।'

ভদ্রলোক প্রথম একটু অবাক হলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি? ওঃ, আমি? আমি মুইন-উস্-সুলতানে। আমার টেনিস-কোর্ট ফরেন অফিসের কাছে। কাল আসবেন।' বলে আমাকে ভালো করে ধন্যবাদ দেবার ফুর্সৎ না দিয়েই মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, মোটরের প্রায় বিশ গজ পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ভৃত্য আবদুর রহমান অ্যারোপ্লেনের প্রপেলারের বেগে দু'হাত নেড়ে আমাকে কি বুঝাবার চেষ্টা করছে। মোটর চলে যেতেই এঞ্জিনের মত ছুটে এসে বলল, 'মুইন-উস-সুলতানে, মুইন-উস-সুলতানে!'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'লোকটি কে বটেন?'

আবদুর রহমান উত্তেজনায় ফেটে চৌচির হয় আর কি। আমি যতই জিজ্ঞাসা করি মুইন-উস্-সুলতানে কে, সে ততই মন্ত্রোচ্চারণের মত শুধু বলে, মুইন-উস্-সুলতানে, মুইন-উস-সুলতানে। শেষটায় নৈরাশ্য, অনুযোগ, ভর্ৎসনা মিশিয়ে বলল, 'চেনেন না বরাদরে-আলা-হজরত,

www.MurchOna.com

বাদশার ভাই,—বড় ভাই। আপনি করেছেন কি? রাজবাড়ির সকলের হাতে চুমো খেতে হয়।'

আমি বললুম, 'রাজবাড়িতে লোক সবসুদ্ধ ক'জন না জেনে তো আর চুমো খেতে আরম্ভ করতে পারিনে। সকলের পোষাবার আগে আমার ঠোঁট ক্ষয়ে যাবে না তো?'

আবদুর রহমান শুধু বলে, 'ইয়া আল্লা, ইয়া রসুল, করেছেন কি, করেছেন কি?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা উনি যদি রাজার বড় ভাই-ই হবেন তবে উনি রাজা হলেন না কেন?'

আবদুর রহমান প্রথম মুখ বন্ধ করে তার উপর হাত রাখল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমি গরীব তার কি জানি; কিন্তু এসব কথা শুধোতে নেই।'

সে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আবদুর রহমান যখন ঘরের এক কোণে বাদামের খোসা ছাড়াতে বসল তখন তার মুখে ঐ এক মুইন-উস্-সুলতানের কথা ছাড়া অন্য কিছু নেই। দু'তিনবার ধমক দিয়ে হার মানলুম। বুঝলুম, সরল আবদুর রহমান মনে করেছে, আফগানিস্থান যখন কাকামামাশালার দেশ, অর্থাৎ বড়লোকের নেকনজর পেলে সব কিছু হাঁসিল হয়ে যায় তখন আমি রাতারাতি উজীরনাজির কেউ-কেটা, কিছু-না-কিছু একটা, হয়ে যাবই যাব।

ততক্ষণে অভিধান খুলে দেখে নিয়েছি মুইন-উস-সুলতানে সমাসের অর্থ 'যুবরাজ।'

যুবরাজ রাজা হলেন না, হলেন ছোট ভাই। সমস্যাটার সমাধান করতে হয়।

তেইশ

মুইন-উস্-সুলতানে বা যুবরাজ রাজা না হয়ে ছোট ছেলে কেন রাজা হলেন সে-সমস্যার সমাধান করতে হলে খানিকটা পিছিয়ে এ-শতকের গোড়ায় পেঁাছতে হয়।

বাঙালী পাঠক এখানে একটু বিপদগ্রস্থ হবেন। আমি জানি, বাঙালী—তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন—আরবী ফার্সী মুসলমানী নাম মনে রাখতে বা বানান করতে অল্পবিস্তর কাতর হয়ে পড়েন। একথা

www.MurchOna.com

জানি বলেই এতক্ষণ যতদূরে সম্ভব কম নাম নিয়েই নাড়াচাড়া করেছি—বিশেষতঃ আনাতোল ফ্রাঁসের মত গুণী যখন বলেছেন, 'পাঠকের কাছ থেকে বড্ড বেশী মনোযোগ আশা করো না, আর যদি মনস্কামনা এই হয় যে, তোমার লেখা শত শত বৎসর পেরিয়ে গিয়ে পরবর্তী যুগে পেঁছুক তাহলে হাল্কা হয়ে ভ্রমণ করো।' আমার সে-বাসনা নেই, কারণ ভাষা এবং শৈলী বাবদে আমার অক্ষমতা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন। কাজেই যখন ক্ষমতা নেই, বাসনাও নেই তখন পাঠকের নিকট ঈষৎ মনোযোগ প্রত্যাশা করতে পারি। মৌসুমী ফুলই মনোযোগ চায় বেশী; দু'দিনের অতিথিকে তোয়াজ করতে মহা কঞ্জুসও রাজী হয়।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন আফগানিস্থানের কর্তা বা আমীর ছিলেন হবীবউল্লা। তাঁর ভাই নসরউল্লা মোল্লাদের এমনি খাস-পেয়ারা ছিলেন যে, বড় ছেলে মুইন-উস্-সুলতানে তাঁর মরার পর আমীর হবেন এ-ঘোষণা হবীবউল্লা বুকে হিম্মৎ বেঁধে করতে পারেননি। বরঞ্চ দুই ভায়ে এই নিষ্পত্তিই হয়েছিল যে হবীবউল্লা মরার পর নসরউল্লা আমীর হবেন, আর তিনি মরে গেলে আমীর হবেন মুইন-উস্-সুলতানে। এই নিষ্পত্তি পাকা-পোক্ত করার মতলবে হবীবউল্লা নসরউল্লা দুই ভাইয়ে

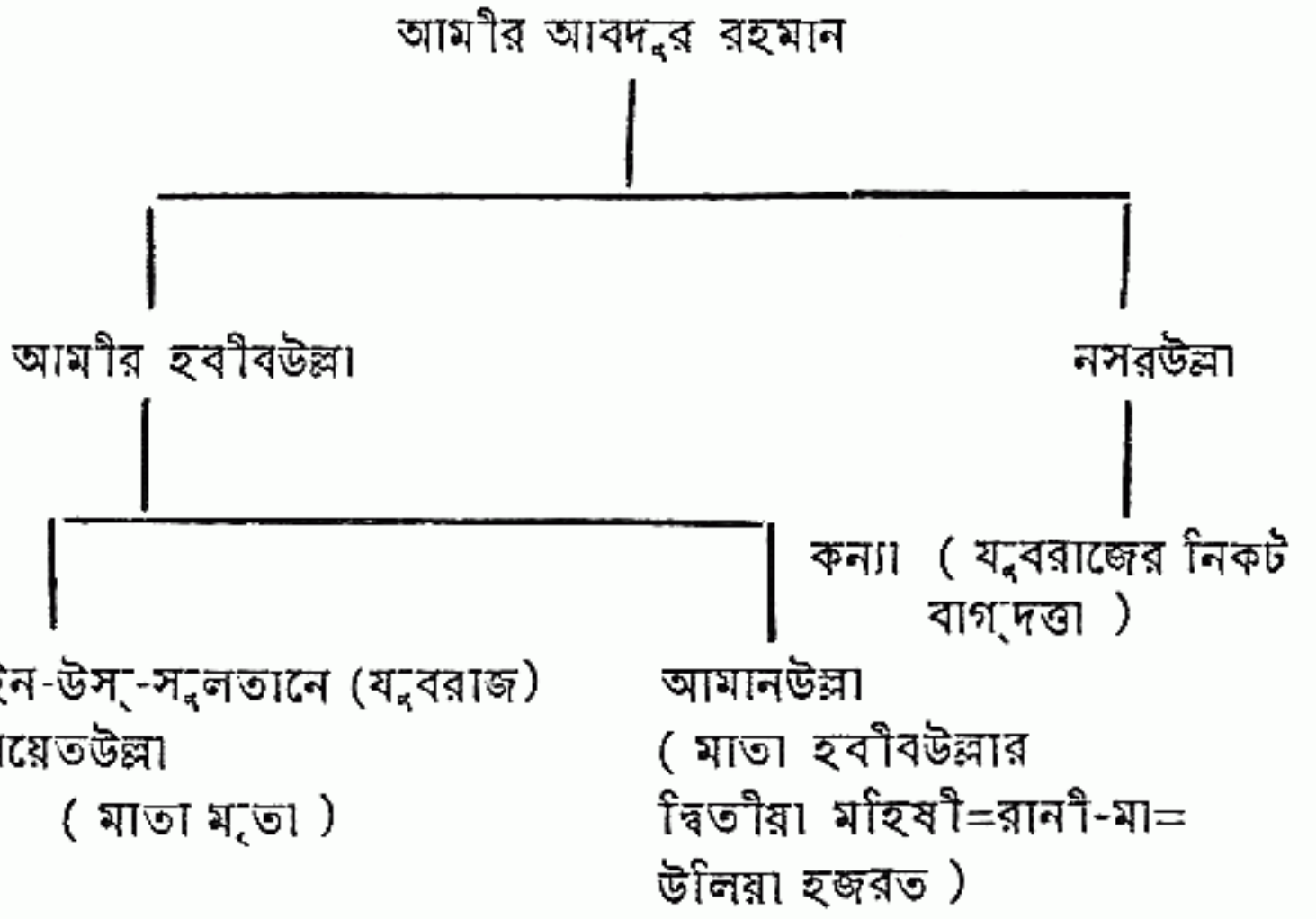

মীমাংসা করলেন যে, মুইন-উস্-সুলতানে নসরউল্লার মেয়েকে বিয়ে করবেন। হবীবউল্লা মনে মনে বিচার করলেন, আর যাই হোক, নসরউল্লা, জামাইকে খুন করে 'দামাদ-কুশ' (জামাতৃহন্তা) আখ্যায় কলঙ্কিত হইতে চাইবেন না। ঐতিহাসিকদের স্মরণ থাকতে পারে যোধপুরের রাজা

www.MurchOna.com

অজিত সিং যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে জামাই দিল্লীর বাদশাহ ফর্‌রুখ সিয়ারকে নিহত করেন তখন দিল্লীর ছেলে-বুড়োর 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ' চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষটায় তিনি দিল্লী ছাড়তে বাধ্য হন। রাস্তার ডেঁপো ছোঁড়ারা পর্যন্ত নির্ভয়ে অজিত সিং-এর পাল্কির দু'পাশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলত আর সেপাই-বরকন্দাজের তম্বী-তম্বাকে বিলকুল পরোয়া না করে তারস্বরে ঐকতানে 'দামাদ-কুশ', 'দামাম-কুশ' বলে অজিত সিংহকে ক্ষেপিয়ে তুলত।

হবীবউল্লা, নসরউল্লা, মুইন-উস্‌-সুলতানে তিনজনই এই চুক্তিতে অল্পবিস্তর সন্তুষ্ট হলেন। একদম নারাজ হলেন, মাতৃহীন মুইন-উস্‌-সুলতানের বিমাতা। ইনি আমানউল্লার মা, হবীবউল্লার দ্বিতীয়া মহিষী। আফগানিস্থানের লোক এঁকে রানী-মা বা উলিয়া হজরত নামে চিনত। এঁর দাপটে আমীর হবীবউল্লার মত খান্ডার ও কুরবানির বকরি অর্থাৎ বলির পাঁঠার মত কাঁপতেন। একবার গোসা করে রানী মা যখন নদীর ওপারে গিয়ে তাঁবু খাটান তখন হবীবউল্লা কোনো কৌশলে তাঁর কিনারা না লাগাতে পেরে শেষটায় এপারে বসে পাগলের মত সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা মেখে তাঁর সংগ্‌-দিল্‌ বা পাষান হৃদয় গলাতে সমর্থ হয়েছিলেন। রানী-মা স্থির করলেন, এই সংসারকে যখন ওমর খৈয়াম দাবাখেলার ছকের সঙ্গে তুলনা করেছেন তখন নসরউল্লা এবং মুইন-উস্‌-সুলতানের মত দুই জব্বর ঘুঁটিকে ঘায়েল করা আমানউল্লার মত নগণ্য বড়ের পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। তাঁর পক্ষেই বা রাজা হওয়া অসম্ভব হবে কেন ?

এমন সময় কাবুলের সেরা খানদানী বংশের মুহম্মদ তর্জী সিরিয়া নির্বাসিন থেকে দেশে ফিরলেন। সঙ্গে পরীর মত তিন কন্যা, কাওকাব, সুরাইয়া আর বিবি খুর্দ। এঁরা দেশবিদেশ দেখেছেন, লেখাপড়া জানেন, রুজ-পাউডার ব্যবহারে ওকিবহাল; এঁদের উদয়ে কাবুল কুমারীদের চেহারা অত্যন্ত ম্লান, বেজৌলুশ, 'অমার্জিত' বা 'অনকলচরড্‌' (আজ্‌ জঙ্গল বর আমদেহ= যেন জঙ্গলী) মনে হতে লাগল।

হবীবউল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমানউল্লার মা—যদিও আসলে দ্বিতীয়া মহিষী কিন্তু মুইন-উস্‌-সুলতানের মাতার মৃত্যুতে প্রধান মহিষী হয়েছেন—এক বিরাট ভোজের বন্দোবস্ত করলেন। অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে পই পই করে বুঝিয়ে দিলেন, যে করেই হোক মুইন-উস্‌-সুলতানকে তর্জীর বড়-মেয়ে কাওকাবের দিকে আকৃষ্ট করাতেই হবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনাচে কানাচে দু'একটা কামরা বিশেষ করে খালি রাখা হল। সেখানে কেউ যেন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত না হয়।

www.MurchOna.com

খানাপিনা চলল, গানবাজনায় রাজবাড়ি সরগরম। রানী-মা নিজে মুইন-উস্-সুলতানকে কাওকাবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আর কাওকাবকে ফিস ফিস করে কানে কানে বললেন, 'ইনিই যুবরাজ, আফগানিস্থানের তখ্‌ৎ একদিন এঁরই হবে।' কাওকাব বুদ্ধিমতী মেয়ে, ক'সের গমে ক'সের ময়দা হয় জানতেন, আর না জানলেই বা কি, শঙ্করাচার্য তরুণতরুণীর প্রধান বৃত্তি সমবন্ধে যে মোক্ষম তত্ত্ব বলেছেন সেটা রাজপ্রাসাদেও খাটে।

প্ল্যানটা ঠিক উতরে গেল। বিশাল রাজপ্রাসাদে ঘুরতে ঘুরতে মুইন-উস্-সুলতানে কাওকাবের সঙ্গে পুরীর এক নিভৃত কক্ষে বিশ্রম্ভালাপে মশগুল হলেন। মুইন ভাবলেন, খুশ-এখতেয়ারে নিভৃত কক্ষে ঢুকেছেন (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে ফ্রীডম অব্ উইল), রানী-মা জানতেন, শিকার জালে পড়েছে (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে প্ল্যান্ড্ ডেসটিনি)।

প্ল্যানমাফিকই রানী-মা হঠাৎ যেন বেখেয়ালে সেই কামরায় ঢুকে পড়লেন। তরুণতরুণী একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়ালেন। রানী-মা সোহাগ মেখে অমিয়া ছেনে সতীনপোকে বললেন, 'বাচ্চা তোমার মা নেই, আমিই তোমার মা। তোমার সুখদুঃখের কথা আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে? তোমার বিয়ের ভার তো আমার কাঁধেই। কাওকাবকে যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তবে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? তজাঁর মেয়ের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়ে তো কাবুলে আর নেই। তোমার দিল কি বলে?'

দিল আর কি বলবে? মুইন তখন ফাটা বাঁশের মাঝখানে।

দিল যা বলে বলুক। মুখে কি বলেছিলেন সে সমবন্ধে কাবুল চারণরা পঞ্চমুখ। কেউ বলেন, নীরবতা দিয়ে সম্মতি দেখিয়েছিলেন; কেউ বলেন, মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ, জানতেন, নসরউল্লার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে; কেউ বলেন, মিনমিন করে সম্মতি জানিয়েছিলেন, কারণ ঠিক তার এক লহমা আগে ভালোমন্দ না ভেবে কাওকাবকে প্রেমনিবেদন করে বসেছিলেন—হয়ত ভেবেছিলেন, প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া—এখন এড়াবেন কি করে? কেউ বলেন, শুধু 'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ' করেছিলেন, তার থেকে হন্ত-নীন্ত ('হাঁ-না',—যে কথা থেকে বাঙলা 'হেন্তনেন্ত' বেরিয়েছে) কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না; কেউ বলেন, তিনি রামগঙ্গা ভালো করে কিছু প্রকাশ করার আগেই রানী-মা কামরা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ কাবুলে চারণদের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বলে।

মোদ্দা কথা এই, সে অবস্থায় আমীর হোক, ফকীর হোক, ঘুঘু হোক,

www.MurchOna.com

কবুতর হোক, আর পাঁচজন গুরুজনের সামনে পড়লে যা করে থাকে বা বলে থাকে মুইন-উস্-সুলতানে তাই করেছিলেন।

কিন্তু কি করে বলেছিলেন সে কথা জানার যত না দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী জানা দরকার রানী-মা মজলিসে ফিরে গিয়ে সে-বলা বা না-বলার কি অর্থ প্রকাশ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্স্ট্-বুক কি-বলে না-বলে সেটা অবান্তর, জীবনে কাজে লাগে বাজারের গাইড-বুক।

রানী-মা পর্দার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও যখন তামাম আফগানিস্থান তাঁর কন্ঠস্বর শুনতে পেত তখন মজলিসের হর্ষোল্লাস যে তাঁর গলার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাতে আর কি সন্দেহ? রানী-মা বললেন, 'আজ বড় আনন্দের দিন। আমার চোখের জ্যোতি (নুর-ই-চশ্ম্) ইনায়েত-উল্লা খান, মুইন-উস্-সুলতানে তর্জীকন্যা কাওকাবকে বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেছেন। খানা-মজলিস দুটোর সময় ভাঙবার কথা ছিল, সে বন্দোবস্ত বাতিল। ফজরের নমাজ (সূর্যোদয়) পর্যন্ত আজকের উৎসব চলবে। আজ রাত্রেই আমি কন্যাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি।'

মজলিসের ঝাড়বাতি দ্বিগুণ আভায় জ্বলে উঠল। চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস, হর্ষধ্বনি। দাসদাসী ছুটলো বিয়ের তত্ত্বতাবাস করতে। সব কিছু সেই দুপুর রাতে রাজবাড়িতেই পাওয়া গেল। আশ্চর্য হওয়ার সাহস কার?

তর্জী হাতে স্বর্গ পেলেন। কাওকাব হৃদয়ে স্বর্গ পেয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা হবীবউল্লার কাছে 'সুসংবাদ' জানিয়ে দূত পাঠালেন। মা ও রাজমহিষীরূপে তিনি মুইন-উস্-সুলতানের হৃদয়ের গতি কোন দিকে জানতে পেরে তর্জীকন্যা কাওকাবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির করেছেন। 'প্রগতিশীল' আফগানিস্থানের ভাবী রাজমহিষী সুশিক্ষিতা হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন কুমারী নেই যিনি কাওকাবের কাছে দাঁড়াতে পারেন। প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান খুদাতালার মেহের-বানীতে সুসম্পন্ন হয়েছে। মহারাজ অতিসত্বর রাজধানীতে ফিরে এসে 'আক্দ-রসুমাতের' (আইনতঃ পূর্ণ বিবাহ) দিন ঠিক করে পৌর-জনের হর্ষবর্ধন করুন।

হবীবউল্লা তো রেগে টং। কিন্তু কান্ডজ্ঞান হারালেন না। আর কেউ বুঝুক না-বুঝুক, তিনি বিলক্ষণ টের পেলেন যে, মূর্খ মুইন-উস্-সুলতানে কাওকাবের প্রেমে পড়ে নসরউল্লার মেয়েকে হারায়নি, হারাতে বসেছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবীবউল্লা যদিও সাধারণতঃ পঞ্চ ম'কার নিয়ে মত্ত থাকতেন তবুও তাঁর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, সমস্ত ষড়যন্ত্রের পিছনে রয়েছেন মহিষী। সৎমার এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না।

www.MurchOna.com

সতীন মা'র কথাগুলি
মধুরসের বাণী
তলা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন
উপর থেকে পানি।

পানি-ঢালা দেখেই হবীবউল্লা বুঝতে পারলেন, গুঁড়িটি নিশ্চয়ই কাটা হয়েছে।

রাগ সামলে নিয়ে হবীবউল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন,—

'খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, মহিষী শুভবুদ্ধি প্রণোদিতা হয়ে এই বিয়ে স্থির করেছেন। তর্জীকন্যা কাওকাব যে সব দিক দিয়ে মুইন-উস্-সুলতানের উপযুক্ত তাতে আর কি সন্দেহ? কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, তর্জীর মেজো মেয়ে সুরাইয়াও তো সুশিক্ষিতা সুরূপা; সুমার্জিতা। দ্বিতীয় পুত্র আমানউল্লাই বা খাস কাবুলী জংলী মেয়ে বিয়ে করবেন কেন? তাই তিনি মহিষীর মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুরাইয়ার সঙ্গে আমানউল্লার বিয়ে স্থির করে এই চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তর্জীর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন। সত্বর রাজধানীতে ফিরে এসে তিনি সবয়ং' ইত্যাদি।

হবীবউল্লা বুঝতে পেরেছিলেন, রানী-মার মতলব মুইন-উস্-সুলতানের স্কন্ধে কাওকাবকে চাপিয়ে দিয়ে, আপন ছেলে আমানউল্লার সঙ্গে নসরউল্লার মেয়ের বিয়ে দেবার। তাহলে নসরউল্লার মরার পর আমানউল্লার আমীর হবার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। হবীবউল্লা সে পথ বন্ধ করার জন্য আমানউল্লার স্কন্ধে সুরাইয়াকে চাপিয়ে দিলেন। যে রানী-মা কাওকাবের বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি সুরাইয়াকে ঠেকিয়ে রাখবেন কোন লজ্জায়? বিশেষ করে যখন চিহ্‌ল্‌সতুন থেকে বাগ্-ই-বালা পর্যন্ত সুবে কাবুল জানে, সুরাইয়া কাওকাবের চেয়ে দেখতে শুনতে পড়াশোনায় অনেক ভালো।

রানী-মার মস্তকে বজ্রাঘাত। বড়ের কিস্তিতে রাজাকে মাত করতে গিয়ে তিনি যে প্রায় চাল-মাতের কাছাকাছি। হবীবউল্লাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত দিলেন, 'নসরউল্লার মেয়েকে তুই পেলিনি, আমিও পেলুম না। তবু মন্দের ভালো; নসরউল্লার কাছে এখন মুইন-উস্-সুলতানে আর আমানউল্লা দু'জনই বরাবর। মুইন-উস্-সুলতানের পাশা এখন আর নসর-কন্যার সীসায় ভারী হবে না তো।—সেই মন্দের ভালো।'

দাবা খেলায় ইংরিজীতে যাকে বলে 'ওয়েটিঙ মুভ' রানী-মা সেই পন্থা অবলম্বন করলেন।

www.MurchOna.com

চব্বিশ

এর পরের অধ্যায় আরম্ভ হয় ভারতবর্ষের রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে নিয়ে।

১৯১৯ সালের মাঝামাঝি জর্মন পররাষ্ট্র বিভাগ রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপের উপদেশ মত স্থির করলেন যে, কোনো গতিকে যদি আমীর হবীবউল্লাকে দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করানো যায় তাহলে ইংরেজের এক ঠ্যাং খোঁড়া করার মতই হবে। ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা পাবার লোভে বিদ্রোহ করুক আর নাই করুক, ইংরেজকে অন্তত একটা পুরো বাহিনী পাঞ্জাবে রাখতে হবে—তাহলে তুর্করা মধ্য-প্রাচ্যে ইংরেজকে কাবু করে আনতে পারবে। ফলে যদি সুয়েজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইংরেজের দু'পা-ই খোঁড়া হয়ে যাবে।

মহেন্দ্রপ্রতাপ অবশ্য আশা করেছিলেন যে, আর কিছু হোক না হোক ভারতবর্ষ যদি ফাঁকতালে স্বাধীনতা পেয়ে যায় তাহলেই যথেষ্ট।

কাইজার রাজাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, স্বর্ণ-ঈগল মেডেল পরিয়ে একদল জর্মন কূটনৈতিকের সঙ্গে আফগানিস্থান রওয়ানা করিয়ে দিলেন। পথে রাজা তুর্কীর সুলতানের কাছ থেকেও অনেক আদর-আপ্যায়ন পেলেন।

কিন্তু পূর্ব-ইরান ও পশ্চিম আফগানিস্থানে রাজা ও জর্মনদলকে নানা বিপদ-আপদ, ফাঁড়া-গর্দিশ কাটিয়ে এগতে হল। ইংরেজ ও রুশ উভয়েই রাজার দৌত্যের খবর পেয়ে উত্তর দক্ষিণ দু'দিক থেকে হানা দেয়। অসম্ভব দুঃখকষ্ট সহ্য করে, বেশীরভাগ জিনিসপত্র পথে ফেলে দিয়ে তাঁরা ১৯১৫ সালের শীতের শুরুতে কাবুল পেঁছান।

আমীর হবীবউল্লা বাদশাহী কায়দায় রাজাকে অভ্যর্থনা করলেন—তামাম কাবুল শহর রাস্তার দু'পাশে ভিড় লাগিয়ে রাজাকে তাঁহাদের আনন্দ অভিবাদন জানালো। বাবুর বাদশাহের কবরের কাছে রাজাকে হবীবউল্লার এক খাস-প্রাসাদে রাখা হল।

কাবুলের লোক সহজে কাউকে অভিনন্দন করে না। রাজার জন্য তারা যে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তার প্রথম কারণ, কাবুলের জনসাধারণ ইংরেজের নষ্টামি ও হবীবউল্লার ইংরেজ-প্রীতিতে বিরক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; নব-তুর্কী

www.MurchOna.com

নব্য-মিশরের জাতীয়তাবাদের ক্বচিৎ-জাগরিত বিহঙ্গকাকলী কাবুলের গুলিস্তান-বোস্তানকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় কারণ, রাজা ভারত-বর্ষের লোক, জর্মনীর শেষ মতলব কি সে সম্বন্ধে কাবুলীদের মনে নানা সন্দেহ থাকলেও ভারতবর্ষের নিঃসার্থপরতা সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। এ-অনুমান কাইজার বার্লিনে বসে করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতীয় মহেন্দ্রকে জর্মন কুটনৈতিকদের মাঝখানে ইন্দ্রের আসনে বসিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

ইংরেজ অবশ্য হবীবউল্লাকে তমবী করে হুকুম দিল, পত্রপাঠ যেন রাজা আর তার দলকে আফগানিস্থান থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু ধূর্ত হবীবউল্লা ইংরেজকে নানা রকম টালবাহানা দিয়ে ঠান্ডা করে রাখলেন। একথাও অবশ্য তাঁর অজানা ছিল না যে, ইংরেজের তখন দু'হাত ভর্তি, আফগানিস্থান আক্রমণ করার মত সৈন্যদলও তার কোমরে নেই।

কিন্তু হবীবউল্লা রাজার প্রস্তাবে রাজী হলেন না। কেন হলেন না এবং না হয়ে ভাল করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক কারণ, অনেক আলোচনা শুনেছি। সে-সব কারণের ক'টা খাঁটী, ক'টা ঝুটা বলা অসম্ভব কিন্তু এ-বিষয় দেখলুম কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, হবীবউল্লা তখন ভারত আক্রমণ করলে সমস্ত আফগানিস্থান তাতে সাড়া দিত। অর্থাৎ আমীর জনমত উপেক্ষা করলেন; জর্মনী, তুর্কী, ভারতবর্ষকেও নিরাশ করলেন।

জর্মনরা, এক বৎসর চেষ্টা করে দেশে ফিরে গেল কিন্তু রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ তখনকার মত আশা ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যতের জন্য জমি আবাদ করতে কসুর করলেন না। রাজা জানতেন, হবীবউল্লার মৃত্যুর পর আমীর হবেন নসরউল্লা নয় মুইন-উস্-সুলতানে। কিন্তু দুটো টাকাই যে মেকি রাজা দু'চারবার বাজিয়ে বেশ বুঝে নিয়েছিলেন। আমান-উল্লার কথা কেউ তখন হিসেবে নিত না কিন্তু রাজা যে তাকে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার পরখ করে নিয়েছিলেন সে কথা কাবুলের সকলেই জানে। কিন্তু তাঁকে কি কানমন্ত্র দিয়েছিলেন সে কথা কেউ জানে না; রাজাও মুখ ফুটে কিছু বলেননি।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাজা কাবুল ছাড়েন। তারপর যুদ্ধ শেষ হল।

শেষ আশায় নিরাশ হয়ে কাবুলের প্রগতিপন্থীরা নির্জীব হয়ে পড়লেন। পর্দার আড়াল থেকে তখন এক অদৃশ্য হাত আফগানিস্থানের ঘুঁটি চালাতে লাগলো, সে হাত আমানউল্লার মাতা রানী-মা উলিয়া হজরতের।

www.MurchOna.com

বহু বৎসর ধরে রানী-মা প্রহর গুনছিলেন এই সুযোগের প্রত্যাশায়। তিনি জানতেন প্রগতিপন্থীরা হবীবউল্লা, নসরউল্লা, মুইন-উস-সুলতানে সমবন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত আমানউল্লার কথা হিসেবেই আনবেন না। পর্দার আড়াল থেকেই রানী-মা প্রগতিপন্থী যুবকদের বুঝিয়ে দিলেন যে, হবীবউল্লা কাবুলের বুকের উপর জগদ্দল পাথর, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও যখন সে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি তখন তাঁরা বসে আছেন কিসের আশায়? নসরউল্লা, মুইন-উস-সুলতানে দু'জনই ভাবেন সিংহাসন তাঁদের হক্কের মাল—সে-মালের জন্য তাঁরা কোনো দাম দিতে নারাজ।

কিন্তু আমানউল্লা দাম দিতে তৈরী। সে দাম কি? বুকেন খুন দিয়ে তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়ে দেশকে সবাধীন করতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমানউল্লাকে আমীর করা যায় কি প্রকারে? রানী-মা বোরকার ভিতর থেকে তারও নীলছাপ বের করলেন। আসছে শীতে হবীবউল্লা যখন নসরউল্লা আর মুইন-উস্-সুলতানকে সঙ্গে নিয়ে জলালাবাদ যাবেন তখন আমানউল্লা কাবুলের গভর্নর হবেন। তখন যদি হবীবউল্লা জলালাবাদে মারা যান তবে কাবুলের অস্ত্রশালা আর কোষাধ্যক্ষের জিম্মাদার গভর্নর আমানউল্লা তার ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পারবেন। রাজা হতে হলে এই দুটো জিনিষই যথেষ্ট।

কিন্তু মানুষ মরে ভগবানের ইচ্ছায়। নীলছাপের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে যে হবীবউল্লা ঠিক তখনই মরবেন তার কি স্থিরতা? অসহিষ্ণু রানী-মা বুঝিয়ে দিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছা মানুষের হাত দিয়েই সফল হয়—বিশেষতঃ যদি তার হাতে তখন একটি নগণ্য পিস্তল মাত্র থাকে।

সবামী হত্যা? এ্যাঁ? হ্যাঁ। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা হচ্ছে না—যেখানে সমস্ত দেশের আশাভরসা, ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গল ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সেখানে কে সবামী, স্ত্রীই বা কে?

শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'কা তব কান্তা?' কিন্তু ঠিক তার পরেই 'সংসার অতীব বিচিত্র' কেন বলেছেন সে তত্ত্বটা এতদিন পর আমার কাছে খোলসা হল।

অর্বাচীনরা তবু শুধালো, 'কিন্তু আমীর হবীবউল্লার সৈন্যদল আর জলালাবাদ অঞ্চলের লোকজন নসরউল্লা বা মুইন-উস্-সুলতানের পক্ষ নেবে না?'

রাগে দুঃখে রানী-মার নাকি কন্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। উষ্মা চেপে শেষটায় বলেছিলেন, 'ওরে মূর্খের দল, জলালাবাদে যেই রাজা হোক না কেন, আমরা রটাব না যে, সিংহাসনের লোভে অসহিষ্ণু হয়ে সেই গুহ্যই নিরীহ হবীবউল্লাকে খুন করেছে?' মূর্খেরা এতক্ষণে

www.MurchOna.com

বুঝল, এস্থলে 'রানীর কি মত ?' নয়। এখানে 'রানীর মতই সকল মতের রানী।'

এসব আমার শোনা কথা—কতটা ঠিক কতটা ভুল হলপ করে বলতে পারব না; তবে এরকমেরই কিছু একটা যে হয়েছিল সে বিষয়ে কাবুল চারণদের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথামালার গল্প ভুল। বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার জন্য লোকও জুটল।

আপন অলসতাই হবীবউল্লার মৃত্যুর আরেক কারণ। জলালাবাদে একদিন সন্ধ্যাবেলা শিকার থেকে ফিরে আসতেই তাঁর এক গুপ্তচর নিবেদন করল যে, গোপনে হুজুরের সঙ্গে সে অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চায়। সে নাকি কি করে শেষ মুহূর্তে এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গিয়েছিল। 'কাল হবে, কাল হবে' বলে নাকি হবীবউল্লা প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে গেলেন। সঙ্গলের সামনে গুপ্তচর কিছু খুলে বলতে পারল না—আমীরও শুধু বললেন, 'কাল হবে, কাল হবে।'

সে কাল আর কখনো হয়নি। সে রাত্রেই গুপ্তঘাতকের হাতে হবীব-উল্লা প্রাণ দেন।

সকালবেলা জলালাবাদে যে কী তুমুল কান্ড হয়েছিল তার বর্ণনার আশা করা অন্যায়। কেউ শুধায়, 'আমীরকে মারল কে ?' কেউ শুধায়, 'রাজা হবেন কে ?' এক দল বলল, 'শহীদ আমীরের ইচ্ছা ছিল নসরউল্লা রাজা হবেন', আরেক দল বলল, 'মৃত আমীরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই; রাজা হবেন বড় ছেলে, যুবরাজ মুইন-উস্-সুলতানে ইনায়েতউল্লা। তখ্‌তের হক তাঁরই।'

বেশীরভাগ গিয়েছিল ইনায়েতউল্লার কাছে। তিনি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। লোকজন যতই জিজ্ঞেস করে 'রাজা হবেন কে ?' তিনি হয় উত্তর দেন না, না হয় ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে বলেন, 'ব কাকায়েম বোরো' অর্থাৎ 'খুড়োর কাছে যাও, আমি কি জানি।' কেন সিংহাসনের লোভ করেননি বলা শক্ত; হয়ত পিতৃশোকে অত্যধিক কাতর হয়ে পড়েছিলেন, হয়ত পিতার ইচ্ছার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন, হয়ত আন্দাজ করেছিলেন যে, যারা তাঁর পিতাকে খুন করেছে তাদের লোকই শেষ পর্যন্ত তখ্‌ৎ দখল করবে। তিনি যদি সে-পথে কাঁটা হয়ে মাথা খাড়া করেন তবে সে-মাথা বেশীদিন ঘাড়ে থাকবে না। অত্যন্ত কাঁচা কাঁচা-লঙ্কাও পাঠার বলী দেখে খুশী হয় না। জানে এবার তাকে পেষায় লগ্ন আসন্ন। নসরউল্লা আমীর হলেন।

এদিকে রানী-মা কাবুলে বসে তড়িৎ গতিতে কাবুল কান্দাহার

www.MurchOna.com

জলালাবাদ হিরাতে খবর রটালেন রাজ্যগৃধ্নু, অসহিষ্ণু, নসরউল্লা ভ্রাতা হবীবউল্লাকে খুন করেছেন। তাঁর আমীর হওয়ার এমনিতেই কোনো হক্ ছিল না—এখন তো আর কোনো কথাই উঠতে পারে না। হক্ ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ মুইন-উস-সুলতানের। তিনি যখন সেচ্ছায়, খুশ-এখতেয়ারে নসরউল্লার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থাৎ সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করেছেন, তখন হক্ বর্তালো আমানউল্লার উপর।

অকাট্য যুক্তি। তবু কাবুল চিৎকার করলো, 'জিন্দাবাদ আমানউল্লা খান'—ক্ষীণকণ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা আমানউল্লার তখ্ৎ লাভে খুশী হয়ে সেপাইদের বিস্তর বখশিশ দিলেন; নূতন বাদশা আমানউল্লা সেপাইদের তনখা অত্যন্ত কম বলে নিতান্ত 'কর্তব্য পালনার্থে' সে তনখা ডবল করে দিলেন। উভয় টাকাই রাজকোষ থেকে বেরলো। কাবুল হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'জিন্দাবাদ আমানউল্লা খান।'

ভলতেয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মন্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মারা যায় কিনা। ভলতেয়ার বলেছিলেন, 'যায়; কিন্তু গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে সেঁকো বিষ খাইয়ে দিলে আর কোনো সন্দেহই থাকবে না।'

আফগান সেপাইয়ের কাছে যুক্তিতর্ক মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায়—টাকাটাই সেঁকো।

আমানউল্লা কাবুল বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন। সজল নয়নে, বলদৃপ্ত কণ্ঠে পিতৃঘাতকের রক্তপাত করবেন বলে শপথ গ্রহণ করলেন, 'যে পাষণ্ড আমার জান্-দিলের পিতাকে হত্যা করেছে তার রক্ত না দেখা পর্যন্ত আমার কাছে জল পর্যন্ত শরাবের মত হারাম, তার মাংস টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত সব মাংস আমার কাছে শূকরের মাংসের মত হারাম।'

আমানউল্লার শত্রুপক্ষ বলে, আমানউল্লা থিয়েটারে ঢুকলে নাম করতে পারতেন; মিত্রপক্ষ বলে, সমস্ত ষড়যন্ত্রটা রানী মা সর্দারের সঙ্গে তৈরী করেছিলেন—আমানউল্লাকে বাইরে রেখে। হাজার হোক 'পিদর-কুশ' বা পিতৃহন্তার হস্ত চুম্বন করতে অনেক লোকই ঘৃণা বোধ করতে পারে। বিশেষতঃ রানী-মা যখন একাই একলক্ষ তখন তরুণ আমানউল্লাকে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নামিয়ে লাভ কি? আফগানিস্থানে স্ত্রীলোকের আমীর হওয়ার রেওয়াজ থাকলে তাঁকে হয়ত সারাজীবনই যবনিকা-অন্তরালে থাকতে হত।

আমানউল্লার সৈন্যদল জলালাবাদ পেঁছিল। নসরউল্লা, ইনায়েতউল্লা

www.MurchOna.com

দু'জনই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন। নসরউল্লা মোল্লাদের কুতুব-মিনার স্বরূপ ছিলেন; সে মিনার থেকে যাজক সম্প্রদায়ের গম্ভীর নিনাদ বহির্গত হয়ে কেন যে সেপাই সান্ত্রী জড়ো করতে পারল না সেও এক সমস্যা।

কাবুল ফেরার পথে যুবরাজ নাকি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেঁদে ফেলেছিলেন। জলালাবাদের যেসব সেপাই তাঁকে আমীরের তখ্‌তে বসাবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল তারা ততক্ষণে আমানউল্লার দলে যোগ দিয়ে কাবুল যাচ্ছে। কান্না দেখে তারা নাকি মুইন-উস্‌-সুলতানের কাছে এসে বারবার বিদ্রূপ করে বলেছিল, 'বলো না এখন, 'ব কাকায়েম বোরো—খুড়োর কাছে যাও, তিনি সব জানেন।' যাও এখন খুড়োর কাছে? এখন দেখি, কাবুল পেঁছিলে খুড়ো তোমাকে বাঁচান কি করে।'

কাবুলের আর্ক দুর্গে দু'জনকেই বন্দী করে রাখা হল। কিছুদিন পর নসরউল্লা 'কলেরায়' মারা যান। কফি খেয়ে নাকি তাঁর কলেরা হয়েছিল। কফিতে অন্য কিছু মেশানো ছিল কিনা সে বিষয়ে দেখলুম অধিকাংশ কাবুল চারণের স্মৃতিশক্তি বড়ই ক্ষীণ।

এর পর মুইন-উস্‌-সুলতানের মনের অবস্থা কি হয়েছিল ভাবতে গেলে আমার মত নিরীহ বাঙালীর মাথা ঘুরে যায়। কল্পনা সেখানে পেঁছয় না, মৃত্যুভয়ের তুলনাও নাকি নেই।

এখানে পেঁছে সমস্ত দুনিয়ার উচিত আমানউল্লাকে বারবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা। প্রাচ্যের ইতিহাসে যা কখনো হয়নি আমানউল্লা তাই করলেন। মাতার হাত থেকে যেটুকু ক্ষমতা তিনি ততদিনে অধিকার করতে পেরেছিলেন তারই জোরে, বিচক্ষণ কূটনৈতিকদের শত উপদেশ গ্রাহ্য না করে তিনি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মুক্তি দিলেন।

এ যে কত বড় সাহসের পরিচয় তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন যাঁরা মোগল-পাঠানের ইতিহাস পড়েছেন। এত বড় দরাজ-দিল আর হিম্মৎ জিগরের নিশান আফগানিস্থানের ইতিহাসে আর নেই।

পঁচিশ

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কানমন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে আমানউল্লা আরো ভালো রকমেই বুঝতে পারলেন যে, চোরের যদি তিন দিন হয় তবে সাধুর মাত্র একদিন। সেই একদিনের হক্কের জোরে তিনি লড়াই জিতেছেন—এখন আবার দুশমনের পালা। আমানউল্লা তার জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

www.MurchOna.com

জমাখরচের খাতা খুলে দেখলেন, জমায় লেখা, আমানউল্লা খান দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন, তিনি আর 'আমীর' আমানউল্লা নন—তিনি 'গাজী' 'বাদশাহ' আমানউল্লা খান।

খরচে লেখা, নসরউল্লার মোল্লার দল যদিও আসর থেকে সরে গিয়েছে তবু তাদের বিশ্বাস নেই। আমানউল্লা ফরাসী জানতেন—'রেকুলের পুর মিয়ো সোতের', অর্থাৎ 'ভালো করে লাফ দেওয়ার জন্য পিছিয়ে যাওয়া' প্রবাদটা তাঁর অজানা ছিল না।

কিন্তু আমানউল্লা মনে মনে স্থির করলেন, মোল্লারা সরকারী রাস্তার কোন্‌খানে খানাখন্দ বানিয়ে রাখবে সে ভয় অহরহ বুকের ভিতর পুষে রাখলে দেশসংস্কারের মোটর টপ্‌ গিয়ারে চালানো অসম্ভব। অথচ পুরা স্পীডে মোটর না চালিয়ে উপায় নেই—সাধুর মাত্র একদিন।

কাবুলে পেঁাছে যে দিকে তাকাই সেখানেই দেখি হরেকরকম সরকারী উর্দিপরা স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা ঘোরাঘুরি করছে। খবর নিয়ে শুনি কোনোটা উর্দি ফরাসী স্কুলের, কোনোটা জর্মন, কোনোটা ইংরিজী আর কোনোটা মিলিটারি স্কুলের। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের পাঠশালা পাশ করে যারা শহরে এসেছে তাদের জন্য ফ্রি বোর্ডিং, লজিং, জামাকাপড়, কেতাবপত্র, ইন্‌স্ট্রুমেন্ট-বক্স, ডিক্‌সনারি, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্য খচ্চরের ভাড়া, এক কথায় 'অল ফাউন্ড।'

ভারতবর্ষের হয়ে আমি বললুম, 'নাথিং লস্ট।'

প্যারিসফের্তা সইফুল আলম বুঝিয়ে বললেন, 'আপনি ভেবেছেন 'অল ফাউন্ড' হলে বিদ্যেও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে জুটে যায়। মোটেই না। হস্টেল থেকে ছেলেরা প্রায়ই পালায়।'

আমি বললুম, 'ধরে আনার বন্দোবস্ত নেই?'

সইফুল আলম বললেন, 'গাঁয়ের ছেলেরা শক্ত হাড়ে তৈরী। পালিয়ে বাড়ি না গিয়ে যেখানে সেখানে দিন কাটাতে পারে। তারও দাওয়াই আমানউল্লা বের করেছেন? হস্টেল থেকে পালানো মাত্রই আমরা সরকারকে খবর দিই। সরকারের তরফ থেকে তখন দু'জন সেপাই ছোকরার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে আসর জমিয়ে বসে, তিন বেলা খায় দায় এবং যদিও হুকুম নেই তবু সকলের জানা কথা যে, কোর্মা-কালিয়া না পেলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ছেলের বাপকে তিন বেলা মার লাগায়। বাপ তখন ছেলেকে খুঁজতে বেরোয়। সে এসে হস্টেলে হাজিরা দেবে, হেডমাস্টারের চিঠি গাঁয়ে পেঁাছবে যে আসামী ধরা দিয়েছে তখন সেপাইরা বাপের ভালো দুম্বাটি কেটে বিদায়-ভোজ খেয়ে তাকে হুঁশিয়ার না করে শহরে ফিরবে। পরিস্থিতিটার পুনরাবৃত্তিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।'

www.MurchOna.com

আমি বললুম, 'কিন্তু পড়াশোনায় যদি কেউ নিতান্তই গর্দভ হয় তবে ?'

'পর পর তিনবার যদি ফেল মারে তবে হেডমাস্টার বিবেচনা করে দেখবেন তাকে ডিসমিস করা যায় কিনা ? বুদ্ধিশুদ্ধি আছে অথচ পড়াশোনায় ঢিলেমি করছে জানলে তার তখনো ছুটি নেই।'

এর পর কোন দেশের রাজা আর কি করতে পারেন ?

মিলিটারি স্কুলের ভার তুর্কদের হাতে। তুর্কী জেনারেলদের ঐতিহ্য বার্লিনের পৎস্‌দাম সমরবিদ্যায়তনের সঙ্গে জড়ানো; তাই শুনলুম স্কুলটি জর্মন কায়দায় গড়া। সেখানে কি রকম উন্নতি হচ্ছে তার খবর কেউ দিতে পারলেন না। শুধু অধ্যাপক বেনওয়া বললেন, 'ইস্কুলটা তুলে দিলে আফগানিস্থানের কিছু ক্ষতি হবে না।'

মেয়েদের শিক্ষার জন্য আমানউল্লা আর তাঁর বেগম বিবি সুরাইয়া উঠেপড়ে লেগেছেন। বোরকা পরে এক কাবুল শহরেই প্রায় দু'হাজার মেয়ে ইস্কুলে যায়, উঁচু পাঁচিলঘেরা আঙিনায় বাস্কেট-বল, ভলি-বল খেলে। সইফুল আলম বললেন, 'লিখতে পড়তে, আঁক কষতে শেখে, সেই যথেষ্ট। আর তাও যদি না শেখে আমার অন্তত কোনো আপত্তি নেই। হারেমের বন্ধ হাওয়ার বাইরে এসে লাফালাফি করছে এই কি যথেষ্ট নয় ?'

আমি সর্বান্তঃকরণে সায় দিলুম। সইফুল আলম কানে কানে বললেন, 'কিন্তু একজন লোক একদম সায় দিচ্ছেন না। রানী-মা।'

শুনে একটু ঘাবড়ে গেলুম। দুই শত্রু নিপাত করে, তৃতীয় শত্রুকে ঠান্ডা রেখে যিনি আমানউল্লাকে বাদশা বানাতে পেরেছেন তাঁর রায়ের একটা মূল্য আছে বৈকি ? তাঁর মতে নাকি এত শিক্ষার খোরাক আফগানিস্থান হজম করতে পারবে না। এই নিয়ে নাকি মাতাপুত্রে মনোমালিন্যও হয়েছে—মাতা অভিমানভরে পুত্রকে উপদেশ দেওয়া বন্ধ করেছেন। বধূ সুরাইয়াও নাকি শাশুড়ীকে অবজ্ঞা করেন।

কিন্তু কাবুল শহর তখন আমানউল্লার চাবুক খেয়ে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে—'দেরেশি' পরে। 'দেরেশি' কথাটা ইংরিজী 'ড্রেস' থেকে এসেছে—অর্থাৎ হ্যাট, কোট, টাই পাতলুন। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, সরকারী কর্মচারী হলেই তাকে দেরেশি পরতে হয় তা সে বিশ টাকার কেরানীই হোক, আর দশ টাকার সিপাই-ই হোক। শুধু তাই নয়, দেরেশি পরা না থাকলে কাবুলি নাগরিক সরকারী বাগানে পর্যন্ত ঢুকতে পায় না। একদিকে সরকারী চাপ, অন্যদিকে বাইরের চাকচিক্যের প্রতি অনুন্নত জাতির মোহ, মাঝখানে সিনেমার উস্কানি, তিনে মিলে কাবুল দেরেশি-পাগল হয়ে উঠেছে।

www.MurchOna.com

ইস্তেক আবদুর রহমানের মনে ছোঁয়াচ লেগেছে। আমি বাড়িতে শিলওয়ার পরে বসে থাকলে সে খুঁতখুঁত করে; আটপৌরে সুট পরে বেরতে গেলে নীলকৃষ্ণ দেরেশি পরার উপদেশ দেয়।

মেয়েরাও তাল রেখে চলেছেন। আমীর হবীবউল্লা হারেমের মেয়েদের ফ্রক ব্লাউজ পরাতেন। আমানউল্লার আমলে দেখি ভদ্রমহিলা মাত্রেই উঁচু হিলের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, আসচ্ছ সিল্কের মোজা, লম্বা-হাতার আঁটসাঁট ব্লাউজ, দস্তানা আর হ্যাট পরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। হ্যাটের সামনে একখানা অতি পাতলা নেট ঝুলছে বলে চেহারাখানা পষ্টাপষ্টি দেখা যায় না। যে মহিলার যত সাহস তাঁর নেটের বুনুনি তত ঢিলে।

Figure কথাটার ফরাসী উচ্চারণ ফিগুর, অর্থ—মুখের চেহারা। ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলতেন, 'কাবুলী মেয়েদের ফিগার বোঝা যায় বটে, কিন্তু ফিগুর দেখবার উপায় নেই।'

কিন্তু দেশের ধনদৌলত না বাড়িয়ে তো নিত্য নিত্য নূতন স্কুল-কলেজ খোলা যায় না, দেরেশি দেখানো যায় না, ফিগার ফলানো যায় না। ধনদৌলত বাড়াতে হলে আজকের দিনে কলকারখানা বানিয়ে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার করতে হয়। তার জন্য প্রচুর পুঁজির দরকার। আফগানিস্থানের গাঁটে সে কড়ি নেই—বিদেশীদের হাতে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ছেড়ে দিতেও বাদশা নারাজ। আমানউল্লার পিতামহ দোর্দণ্ড-প্রতাপ আবদুর রহমান বলতেন, 'আফগানিস্থান সেইদিনই রেলগাড়ি চালাবে যেদিন সে নিজের হাতে রেলগাড়ি তৈরী করতে পারবে।' পিতা হবীবউল্লা সে আইন ঠিক ঠিক মেনে চলেননি—তবে কাবুলের বিজলী বাতির জন্য যে কলকব্জা কিনেছিলেন সেটা কাবুলী টাকায়। আমানউল্লা কি করবেন ঠিক মনস্থির করতে পারছিলেন না—ন্যাশনাল লোন তোলার উপদেশ কেউ কেউ তাঁকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাহলে সবাইকে সুদ দিতে হয় এবং সুদ দেওয়া নেওয়া ইসলামে বারণ।

হয়ত আমানউল্লা ভেবেছিলেন যে, দেশের গুরুভারের খানিকটে নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে দেশের আর পাঁচজনের কাঁধে যদি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া যায় তাহলে প্রগতির পথে চলার সুবিধে হবে। আমানউল্লা বললেন, 'পার্লিমেন্ট তৈরী করো।'

সে পার্লিমেন্টের সরূপ দেখতে পেলুম পাগমান গিয়ে।

কাবুল থেকে পাগমান কুড়িমাইল রাস্তা। বাস চলাচল আছে। সমস্ত শহরটা গড়ে তোলা হয়েছে পাহাড়ের থাকে থাকে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা শাঁখ কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার ভাঁজে ভাঁজে ছোট

www.MurchOna.com

ছোট বাঙলো; অনেকটা ইতালিয়ান ভিলার মত। সমস্ত পাগমান শহর জুড়ে আপেল নাসপাতির গাছ বাঙলোগুলোকে ঘিরে রেখেছে আর চূড়ার বরফগলা ঝরণা রাস্তার এক পাশের নালা দিয়ে থাকে থাকে নেমে এসেছে। পিচ ঢালা পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে উঠছি আর দেখছি দুদিকে ঘন সবুজের নিবিড় স্তব্ধ সুষুপ্তি। কোনো দিকে কোনো প্রকার জীবন-যাত্রার চঞ্চলতা নেই, কঠিন পাথরের খাড়া দেয়াল নেই, ঘিনঘিনে হলদে রঙের বাড়িঘরদোর নেই। কিছুতেই মনে হয় না যে, নীরস কর্কশ আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে চলেছি, থেকে থেকে ভুল লাগে আর চোখ চেয়ে থাকে সামনের মোড় ফিরতেই নেবুর ঝুড়ি কাঁধে খাসিয়া মেয়ে-গুলোকে দেখবে বলে।

বাদশা আমীর-ওমরাহ নিয়ে গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটান। এক সপ্তা-হের জন্য তামাম আফগানিস্থান এখানে জড়ো হয় 'জশন' বা সাধীনতা দিবসের আমোদ আহ্লাদ করার জন্য। দল বেঁধে আপন আপন তাঁবু সঙ্গে নিয়ে এসে তারা রাস্তার দু'দিকে যেখানে সেখানে সেগুলো খাটায়। সমস্ত দিন কাটায় চাঁদমারি, মঙ্গোল নাচ, পল্টনের কুচকাওয়াজ দেখে, না হয় চায়ের দোকানে আড্ডা জমিয়ে; রাত্রে তাঁবুতে তাঁবুতে শুরু হয় গানের মজলিস। "আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই; জোয়ান হইব গোড়া হতে তবে এ জীবন দোহরাই"—ধরনের ওস্তাদী গানের রেওয়াজ প্রায় নেই, হরেকরকম "ফতুজানকে" অনেকরকম সাধ্য-সাধনা করে ডাকাডাকি করা হচ্ছে এ-সব গানের আসল ঝোঁক। মাঝে মাঝে একজন অতিরিক্ত উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে দু'চার চক্কর নাচ ভী দেখিয়ে দেয়। আর সবাই গানের ফাঁকে ফাঁকে 'সাবাস সাবাস' বলে নাচনেওয়ালাকে উৎসাহ দেয়।

এ-রকম মজলিসে বেশীক্ষণ বসা কঠিন। বন্ধ ঘরে যদি সবাই সিগারেট ফোঁকে তবে নিজকেও সিগারেট ধরাতে হয়—না হলে চোখ জ্বালা করে, গলা খুসখুস করতে থাকে। এ-সব মজলিসে আপনিও যদি মনের ভিতর কোনো "ফতুজান" বা কদম্ববনবিহারিণীর ছবি এঁকে গলা মিলিয়ে—না মিললেও আপত্তি নেই—চিৎকার করে গান না জোড়েন তবে দেখবেন ক্রমেই কানে তালা লেগে আসছে, শেষটায় ফাটার উপক্রম। রাগবি খেলার সঙ্গে এ-সব গানের অনেক দিক দিয়ে মিল আছে—তাই এর রসভোগ করতে হয় বেশ একটু তফাতে আলগোছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু আমার বার বার মনে হ'ল পাগমান হৈ-হল্লার জায়গা নয়। নির্ঝরের ঝরঝর, পত্র-পল্লবের মৃদু মর্মর, অচেনা পাখির একটানা কূজন, পচা পাইনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, সবসুদ্ধ মিলে গিয়ে এখানে বেলা

www.MurchOna.com

দ্বিপ্রহরেও মানুষের চোখে তন্দ্রা আসে। ভর গ্রীষ্মকাল, গাছের তলায় বসলে তবু শীত শীত করে—কোটের কলারটা তুলে দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় পেয়ালা, প্রিয়া, কবিতার বই কিছুরই প্রয়োজন নেই, একখানা র‍্যাপার পেলে ওমটা ঠিক জমত।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। চোখ মেলে দেখি এক অপরূপ মূর্তি। কাঁচা-পাকা লম্বা দাঁড়িওয়ালা, ঘামে-ভেজা, আজন্ম অস্নাত অধৌত, পীত দন্তকৌমুদী বিকশিত এক আফগান সামনে দাঁড়িয়ে। এরূপ আফগান অনেক দেখেছি, কিন্তু এর পরনে ধারালো ক্রীজওয়ালা সদ্য নূতন কালো পাতলুন, কালো ওয়েস্টকোট, স্টার্চ করা শক্ত শার্ট, কোণ-ভাঙা স্টিফ কলার, কালো টাই, দু'বোতামওয়ালা নব্যতম কাটের মর্নিং-কোট আর একমাথা বাবরি চুলের উপর দেড়ফুট উঁচু, চকচকে সিল্কের অপেরা-হ্যাট! সবকিছু আনকোরা ঝাঁ-চকচকে নূতন; দেখে মনে হল যেন এই মাত্র দর্জির কার্ড বোর্ডের বাক্স থেকে বের করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে পরা হয়েছে। যা তা 'দেরেশি' নয়, ষোল আনা মর্নিং-সুট। প্যারেডের দিনে লাল-বেলাট এই রকম সুট পরে সেলুট নেন।

বেল্টের অভাবে পাজামার নোংরা নেওয়ার দিয়ে পাতলুন বাঁধা, কালো ওয়েস্টকোট আর পাতলুনের সঙ্গমস্থল থেকে একমুঠো ধবধবে সাদা শার্ট বেরিয়ে এসেছে. টাইটাও ওয়েস্টকোটের উপরে ঝুলছে।

বাঁ হাতে পাগড়ির কাপড় দিয়ে বানানো বোঁচকা, ডান হাতে ফিতেয় বাঁধা একজোড়া নূতন কালো বুট। তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি পায়ে জুতো-মোজা নেই!

আমাকে পশতু ভাষায় অভিবাদন করে বোঁচকাটা কাঁধে ফেলে, লম্বা হাতে বুট জোড়া দোলাতে দোলাতে ওরাঙওটাঙের মত বড় রাস্তার দিকে রওয়ানা হল।

আমি তো ভেবে ভেবে কোনো কুলকিনারা পেলুম না যে, এ রকমের আফগান এ-ধরনের সুট পেলেই বা কোথায়, আর এর প্রয়োজনই বা তার কি! কিন্তু ঐ এক মূর্তি নয়। বন থেকে বেরবার আগে হুবহু এক দ্বিতীয় মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে দেখি এক মুচীর সামনে উবু হয়ে বসে গল্প জুড়েছে আর মুচী তার বুটের তলায় লোহা ঠুকে ঠুকে আলপনা এঁকে দিচ্ছে।

পরের দিন আমানউল্লার বক্তৃতা। সভায় যাবার পথে এ-রকম আরো ডজনখানেক মূর্তির সঙ্গে দেখা হল। সেখানে গিয়ে দেখি সভার সবচেয়ে ভালো জায়গায়, প্ল্যাটফর্মের মুখোমুখি প্রায় শ'দেড়েক লোক এ-রকম মর্নিং-সুটের ইউনিফর্ম পরে বসে আছে। এরাই প্রথম আফগান পার্লিমেন্টের সদস্য।

www.MurchOna.com

যে তাজিক, হাজারা, মঙ্গোল, পাঠান আপন আপন জাতীয় পোষাক পরে এতকাল স্বচ্ছন্দে ঘরে-বাইরে ঘোরাফেরা করেছে, বিদেশীর মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আজ তারা বিকট বিজাতীয় বেশভূষা ধারণ করে সভাস্থলে কাঠের মত বসে আছে। শুনেছি অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করে, কিন্তু এদের তো শুধু কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়নি, সর্বাঙ্গে যেন কৃষ্ণচন্দন লেপে দেওয়া হয়েছে !

আমানউল্লা দেশের ভূতভবিষ্যৎবর্তমান সম্বন্ধে অনেক খাঁটি কথা বললেন। কাবুলের লোক হাততালি দিল। সদস্যদের তালিম দেওয়া হয়েছিল কিনা জানিনে, তারা এলোপাতাড়ি হাততালি দিয়ে লজ্জা পেয়ে এদিক ওদিক তাকায়; ফরেন অফিসের কর্তারা আরো বেশী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করেন। বিদেশী রাজদূতেরা অপলক দৃষ্টিতে আমান-উল্লার দিকে তাকিয়ে—সেদিন বুঝতে পারলুম রাজদূত হতে হলে কতদূর আত্মসংযম, কত জোর চিত্তজয়ের প্রয়োজন।

জানি, সুট ভালো করে পরতে পারা না-পারার উপর কিছুই নির্ভর করে না কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কি প্রয়োজন ছিল লেফাফাদুরস্ত হওয়ার লোভে দেড়শ' জন গাঁওবুড়াকে লাঞ্ছিত করে নিজে বিড়ম্বিত হওয়ার ?

আমানউল্লার বক্তৃতা এরা কতদূর বুঝতে পেরেছিল জানিনে—ভাষা এক হলেই তো আর ভাবের বাজারের বেচাকেনা সহজ ও সরল হয়ে ওঠে না। শুনেছি, পুরানো বোতলও নাকি নয়া মদ সইতে পারে না ।

ছাব্বিশ

গ্রীষ্মকালটা কাটল ক্ষেত-খামারের কাজ দেখে দেখে। আমাদের দেশে সে সুবিধে নেই; ঠাঠা রোদ্দুর, ঝমাঝম বৃষ্টি, ভলভলে কাদা আর লিকলিকে জোঁকের সঙ্গে একটা রফারফি না করে আমাদের দেশের ক্ষেত-খামারের পয়লা দিকটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই। এদেশের চাষবাসের বেশীরভাগ শুকনো-শুকনিতে। শীতের গোড়ার দিকে বেশ ভালো করে একদফা হাল চালিয়ে দেয়; তারপর সমস্ত শীত-কাল ধরে চাষীর আশা যেন বেশ ভালো রকম বরফ পড়ে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে বার কয়েক ক্ষেতের উপর বরফ জমে আর গলে; জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে অনেক নিচে ঢোকে আর সমস্ত ক্ষেতটাকে বেশ নরম করে দেয়। বসন্তের শুরুতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়, কিন্তু মাঠঘাট ডুবে যায় না। আধাভেজা আধা শুকনোতে তখন ক্ষেতের কাজ চলে—নালার ধারে গাছতলায় একটু-

www.MurchOna.com

খানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বেশ আরাম করে বসে ক্ষেতের কাজ দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না। তারপর গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে পাহাড়ের উপরকার জমা-বরফ গলে কাবুল উপত্যকায় নেমে এসে খাল-নালা ভরে দেয়। চাষীরা তখন নালায় বাঁধ দিয়ে দু'পাশের ক্ষেতকে নাইয়ে দেয়। ধান ক্ষেতের মত আল বেঁধে বেবাক জমি টৈটম্বুর করে দিতে হয় না।

কোন্ চাষীর কখন নালায় বাঁধ দেবার অধিকার সে সম্বন্ধে বেশ কড়া-কড়ি আইন আছে। শুধু তাই নয়, নালার উজান ভাঁটির গাঁয়ে গাঁয়ে জলের ভাগবাঁটোয়ারার কি বন্দোবস্ত তারও পাকাপাকি শর্ত সরকারের দফতরে লেখা থাকে। মাঝে মাঝে মারামারি মাথা ফাটাফাটি হয়, কিন্তু কাবুল উপত্যকার চাষারা দেখলুম বাঙালী চাষার মতই নিরীহ—মারামারির চেয়ে গালাগালিই বেশী পছন্দ করে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, কাবুল উপত্যকা বাংলা দেশের জমির চেয়েও উর্বরা। তার উপর তাদের আরেকটা মস্ত সুবিধা এই যে, তারা শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না। শীতকালে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বরফ পড়ে তাদের ক্ষেত ভরে যায়, অথবা যদি পাহাড়ের বরফ প্রচুর পরিমাণে গলে নেমে আসে, তাহলে তারা আর বৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। কাবুলের লোক তাই বলে, 'কাবুল বেজর্, শওদ লাকিন বে-বর্ফন্, বাশদ'—কাবুল সবুর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায় দশহাত চওড়া একটি নালা বয়ে যায়। তার দু'দিকে দু'সারি উঁচু চিনার গাছ, তারই নিচে দিয়ে পায়ে চলার পথ। আমি সেই পথ দিয়ে নালা উজিয়ে উজিয়ে অনেক দূরে গিয়ে একটা পঞ্চবটির মত পাঁচচিনারের মাঝখানে বরসাতি পেতে আরাম করে বসতুম। একটু উজানে নালায় বাঁধ দিয়ে আরেক চাষা তার ক্ষেত নাওয়াচ্ছে। আমি যে ক্ষেতের পাশে বসে আছি তার চাষা আমার সঙ্গে নানারকম সুখদুঃখের কথা কইছে। এ দু'জনের কান মসজিদের দিকে —কখন আসরের (অপরাহ্ন) নমাজের আজান পড়বে। তখন আমার চাষার পালা। আজান পড়া মাত্রই সে উপরের বাঁধের পাথর-কাদা সরিয়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে কূলকূল করে নীচের বাঁধের জল ভর্তি হতে শুরু করে; চাষা তার বাঁধ আগের থেকেই তৈরী করে রেখেছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে তখন বাঁধের তদারক করে বেড়ায়, কাঠের শাবল দিয়ে মাঝে মাঝে কাদা তুলে সেটাকে আরও শক্ত করে দেয়, ক্ষেতের ঢেলা মাটি এদিকে ওদিকে সরিয়ে দিয়ে বানের জলের পথ করে দেয়। শিলওয়ারটা হাঁটুর উপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে, জামাটা খুলে গাছতলায় পাথরচাপা দিয়ে

www.MurchOna.com

রেখেছে, আর পাগড়ির লেজ দিয়ে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছছে। আমি ততক্ষণে তার হুঁকোটার তদারক করছি। সে মাঝে মাঝে এসে দু'একটা দম দেয় আর পাগড়ির লেজ দিয়ে হাওয়া খায়। আমাদের চাষার গামছা আর কাবুলী চাষার পাগড়ি দুই-ই একবস্তু। হেন কর্ম নেই যা গামছা আর পাগড়ি দিয়ে করা যায় না—ইস্তেক মাছ ধরা পর্যন্ত। যদিও আমাদের নালায় সব সময়ই দেখেছি অতি নগণ্য পোনা মাছ।

বেশ বেলা থাকতে মেয়েরা কলসী মাথায় 'জলকে' আসত। গোড়ার দিকে আমাকে দেখে তারা মুখের উপর ওড়না টেনে দিত, আমাদের দেশের চাষীর বউ যে রকম 'ভদ্দর নোককে' দেখলে 'নজ্জা' পায়। তবে এদের 'নজ্জা' একটু কম। ডান হাত দিয়ে বুকের উপর ওড়না টেনে বাঁহাত দিয়ে হাঁটুর উপরে পাজামা তুলে এরা প্রথম দর্শনে আরবী ঘোড়ার মত ছুট দেয়নি আর অল্প কয়েকদিনের ভিতরই তারা আমার সামনে সচ্ছন্দে আমার চাষা বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল।

কিন্তু চাষা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশীদিন টিকলো না। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মুইন-উস্-সুলতানে। চাষাই বলল, সে প্রথমটায় তার চোখকে বিশ্বাস করেনি যখন দেখতে পেল তারি আগা (ভদ্রলোক) বন্ধু মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি (টেনিস) খেলছেন। আমি তাকে অনেক করে বোঝালুম যে, তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, সেও সায় দিল, কিন্তু কাজের বেলা দেখলুম সে আর আমাকে তামাক সাজতে দেয় না, আগের মত প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না, 'তো'র বদলে হঠাৎ 'শুমা' বলতে আরম্ভ করেছে আর সম্মানার্থে বহুবচন যদি বা সর্বনামে ঠিক রাখে তবু ক্রিয়াতে একবচন ব্যবহার করে নিজের ভুলে নিজেই লজ্জা পায়। ভাষা শুধরাতে গিয়ে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলে, আর কিছুতেই ভুলতে পারে না যে, আমি মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি খেলি। আমাদের তেলতেলে বন্ধুত্ব কেমন যেন করকরে হয়ে গেল।

কিন্তু লেনদেন বন্ধ হয়নি; যতদিন গাঁয়ে ছিলুম প্রায়ই মুর্গিটা আন্ডাটা দিয়ে যেত। দাম নিতে চাইত না, কেবল আবদুর রহমানের খাবার ভয়ে যা নিতান্ত না নিলে চলে না তাই নিতে স্বীকার করত।

হেমন্তের শেষের দিকে ফসলকাটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন চাষা কাঠুরে হয়ে গেল। আমাকে আগের থেকেই বলে রেখেছিল—একদিন দেখি পাঁচ গাধা-বোঝাই শীতের জ্বালানি কাঠ নিয়ে উপস্থিত। আবদুর রহমানের মত খুঁতখুঁতে লোকও উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করল যে, এ রকম পয়লা নম্বরের নিম-তর্ নিম-খুশ্‌ক্ (আধা-ভেজা) কাঠ কাবুল বাজারের কোথাও পাওয়া যায় না। আবদুর রহমান আমাকে বুঝিয়ে

www.MurchOna.com

বলল যে, সম্পূর্ণ শুকনো হলে কাঠ তাড়াতাড়ি জ্বলে গিয়ে ঘর বড্ড বেশী গরম করে তোলে, তাতে আবার খর্চাও হয় বেশী। আর যদি সম্পূর্ণ ভেজা হয় তাহলে গরমের চেয়ে ধুঁয়োই বেরোয় বেশী, যদিও খর্চা তাতে কম।

এবার দাম দেবার বেলায় প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। আমি তাকে কাবুলের বাজার-দর দিতে গেলে সে শুধু বলে যে, কাবুলের বাজারে সে অত দাম পায় না। অনেক তর্কাতর্কির পর বুঝলুম যে, বাজারের দরের বেশ খানিকটা পুলিশ ও তাদের ইয়ার-বক্সীকে দিয়ে দিতে হয়। শেষটায় গোলমাল শুনে মাদাম জিরার এসে মিটমাট করে দিয়ে গেলেন।

আমাদের দিলখোলা বন্ধুত্ব প্রায় লোপ পাবার মত অবস্থা হল যেদিন সে শুনতে পেল আমি 'সৈয়দ।' তারপর দেখা হলেই সে তার মাথার পাগড়ি ঠিক করে বসায় আর আমার হাতে চুমো খেতে চায়। আমি যতই বাধা দিই, সে ততই কাতর নয়নে তাকায়, আর পাগড়ি বাঁধে আর খোলে।

তামাক-সাজার সত্যযুগের কথা ভেবে নিঃশ্বাস ফেললুম।

ডিমোক্রেসি বড় ঠুনকো জিনিস; কখন যে কার অভিসম্পাতে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। তারপর আর কিছুতেই জোড়া লাগে না।

সাতাশ

হেমন্তের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতন থেকে মৌলানা জিয়াউদ্দীন এসে কাবুলে পৌঁছলেন। বগদানফ, বেনওয়া, মৌলানা আমাতে মিলে তখন 'চারইয়ারী' জমে উঠল।

জিয়াউদ্দীন অমৃতসরের লোক। ১৯২১ সালের খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ছাড়েন। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্র-নাথের শিষ্য হন এবং পরে ভালো বাঙলা শিখেছিলেন। বেশ গান গাইতে পারতেন আর রবীন্দ্রনাথের অনেক গান পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করে মূল সুরে গেয়ে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যসভায় আসর জমাতেন। এখানে এসে সে সব গান খুব কাজে লেগে গেল, কাবুলের পাঞ্জাবী সমাজ তাঁকে লুফে নিল। মৌলানা ভালো ফার্সী জানতেন বলে কাবুলীরাও তাঁকে খুব সম্মান করত।

কিন্তু 'চারইয়ারী' সভাতে ভাঙন ধরল। বগদানফের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলেন। বেনওয়া সায়েব তখন বড্ড মনমরা হয়ে গেলেন। কাবুলে তিনি কখনো

www.MurchOna.com

খুব আরাম বোধ করেননি। এন্ড্রুজ, পিয়ার্সনকে বাদ দিলে বেনওয়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খাঁটী সমজদার। শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক প্রায়ই উদাস হয়ে যেতেন আর খামকা কাবুলের নিন্দা করতে আরম্ভ করতেন।

বেনওয়া সায়েবই আমাকে একদিন রাশান এমেবসিতে নিয়ে গেলেন।

প্রথম দর্শনেই তাভারিশ দেমিদফকে আমার বড় ভালো লাগলো। রোগা চেহারা, সাধারণ বাঙালীর মতন উঁচু, সোনালী চুল, চোখের লোম পর্যন্ত সোনালী, শীর্ণ মুখ আর দুটি উজ্জ্বল তীক্ষ্ন নীল চোখ। বেনওয়া যখন আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি মুখ খোলার আগেই যেন চোখ দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছিলেন। সাধারণ কন্টিনেন্টালের চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকে তিনি হ্যান্ডশেক করলেন, আর হাতের চাপ দেওয়ার মাঝ দিয়ে অতি সহজ অভ্যর্থনার সহৃদয়তা প্রকাশ করলেন।

তাঁর স্ত্রীরও রেশমী চুল, তবে তিনি বেশ মোটাসোটা আর হাসিখুশী মুখ। কোথাও কোনো অলঙ্কার পরেননি, লিপস্টিক রুজ তো নয়ই। হাত দুখানা দেখে মনে হল ঘরের কাজকর্মও বেশ খানিকটা করেন। সাধারণ মেয়েদের কপালের চেয়ে অনেক চওড়া কপাল, মাথার মাঝখানে সিঁথি আর বাঙালী মেয়েদের মত অযত্নে বাঁধা এলোখোঁপা।

কর্তা কথা বললেন ইংরিজীতে, গিন্নী ফরাসীতে।

অভিজ্ঞান শেষ হতে না হতেই তাভারিশ দেমিদভা বললেন, 'চা, অন্য পানীয়, কি খাবেন বলুন।'

ইতিমধ্যে দেমিদফ পাপিরসি (রাশান সিগরেট) বাড়িয়ে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে তৈরী।

আমি বাঙালী, বেনওয়া সায়েব শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে আধা-বাঙালী হয়ে গিয়েছেন আর রাশানরা যে চা খাওয়াতে বাঙালীকেও হার মানায় সে তো জানা কথা।

তবে খাওয়ার কায়দাটা আলাদা। টেবিলের মাঝখানে সামোভার; তার জল টগ্‌বগ করে ফুটছে। এদিকে টি-পটে সকালবেলা মুঠো পাঁচেক চা আর গরম জল দিয়ে একটা ঘন মিশকালো লিকার তৈরী করা হয়েছে—সেটা অবশ্য ততক্ষণে জুড়িয়ে হিম হয়ে গিয়েছে। টি-পট হাতে করে প্রত্যেকের পেয়ালা নিয়ে মাদাম শুধান, 'কতটা দেব বলুন।' পেয়ালাটাক নিলেই যথেষ্ট; সামোভারের চাবি খুলে টগ্‌বগে গরম জল তাতে মিশিয়ে নিলে দু'য়ে মিলে তখন বাঙালী চায়ের রঙ ধরে। কায়দাটা মন্দ নয়, একই লিকার দিয়ে কখনো কড়া, কখনো ফিকে যা খুশী খাওয়া যায়। দুধের রেওয়াজ নেই, দুধ গরম করার হাঙ্গামও নেই। সকাল বেলাকার তৈরী লিকারে সমস্ত দিন চলে।

www.MurchOna.com

সামোভারটি দেখে মুগ্ধ হলুম। রুপোর তৈরী। দু'দিকের হ্যান্ডেল, উপরের মুকুট, জল খোলার চাবি, দাঁড়াবার পা সব কিছুতেই পাকা হাতের সুন্দর, সুদক্ষ, সূক্ষ্ম কাজ করা।

তারিফ করে বললুম, 'আপনাদের রুপোর তাজমহলটি ভারি চমৎকার।'

দেমিদফের মুখের উপর মিষ্টি লাজুক হাসি খেলে গেল—ছোট ছেলেদের প্রশংসা করলে যে রকম হয়। মাদাম উচ্ছ্বসিত হয়ে বেনওয়া সায়েবকে বললেন, 'আপনার ভারতীয় বন্ধু ভালো কমপ্লিমেন্ট দিতে জানেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাজমহল ছাড়া ভারতীয় আর কোনো ইমারতের সঙ্গে তুলনা দিলে কিন্তু চলত না মসিয়ো; আমি ঐ একটির নাম জানি, ছবি দেখেছি।'

তখন দেমিদফ বললেন, 'সামোভারটি তুলা শহরে তৈরী।'

আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললুম, 'কোথায় যেন চেখফ না গর্কির লেখাতে একটা রাশান প্রবাদ পড়েছি, 'তুলাতে সামভার নিয়ে যাওয়ার মত।' আমরা বাঙলাতে বলি, 'তেলা মাথায় তেল ঢালা।'

'কেরিইং কোল টু নিউ কাস্‌ল,' 'বরেলি মে বাঁস লে জানা' ইত্যাদি সব ক'টাই আলোচিত হল। আমার ফরাসী প্রবাদটিও মনে পড়েছিল, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী নিয়ে যাওয়া' কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করে সেটা চেপে রাখলুম। হাফিজও যখন বলেছেন, 'আমি কাজী নই মোল্লাও নই, আমি কোন্ দুঃখে 'তওবা' (অনুতাপ) করতে যাব,' আমি ভাবলুম, 'আমি ফরাসী নই, আমার কি দায় রসাল প্রবাদটা দাখিল করবার।'

দেমিদফ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবর্ষের লোক রাশান কথা-সাহিত্য পড়ে কিনা।'

আমি বললুম, 'গোটা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কোনো মত দেওয়া কঠিন কিন্তু বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বলতে পারি সেখানে এককালে ফরাসী সাহিত্য যে আসন নিয়েছিল সেটা কয়েক বৎসর হল রুশকে ছেড়ে দিয়েছে। বাঙলা দেশের অনেক গুণী বলেন, 'চেখফ মপাসাঁর চেয়ে অনেক উঁচু দরের সৃষ্টা।'

বাঙলা দেশ কেন সমস্ত ভারতবর্ষই যে ক্রমে ক্রমে রুশ সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে সে সম্বন্ধে বেনওয়া সায়েব তখন অনেক আলোচনা করলেন। ভারতবাসীর সঙ্গে রুশের কোন জায়গায় মনের মিল, অনুভূতির ঐক্য, বাতাবরণের সাদৃশ্য, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বেনওয়া অনেকক্ষণ ধরে আপন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাষায় মজলিসী কায়দায় পরিবেশন

www.MurchOna.com

করলেন। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে যে প্রচুর রাশান নভেল, ছোট গল্পের বই মজুদ আছে সে কথাও বলতে ভুললেন না।

দেমিদফ বললেন, 'রাশানরা প্রাচ্য না পাশ্চাত্যের লোক তার স্থিরবিচার এখনো হয়নি। সামান্য একটা উদাহরণ নিন না। খাঁটি পশ্চিমের লোক শার্ট পাতলুনের নিচে গুঁজে দেয়, খাঁটী প্রাচ্যের লোক, তা সে আফগানই হোক আর ভারতীয়ই হোক, কুর্তাটা ঝুলিয়ে দেয় পাজামার উপরে। রাশানরা এ দুদলের মাঝখানে—শার্ট পরলে সেটা পাতলুনের নিচে গোঁজে, রাশান কুর্তা পরলে সেটা পাতলুনের উপর ঝুলিয়ে দেয়—সে কুর্তাও আবার প্রাচ্য কায়দায় তৈরী, তাতে অনেক রঙ অনেক নক্সা।'

দেমিদফের মত অত শান্ত ও ধীর কথা বলতে আমি কম লোককেই শুনেছি। ইংরিজী যে খুব বেশী জানতেন তা নয় তবু, যেটুকু জানতেন তার ব্যবহার করতেন বেশ ভেবেচিন্তে, সযত্নে শব্দ বাছাই করে করে।

রাশান সাহিত্যে আমার শখ দেখে তিনি টলস্টয়, গর্কি ও চেখফ ইয়াসনা পলিয়ানাতে যে সব আলাপ-আলোচনা করেছিলেন তার অনেক কিছু বর্ণনা করে বললেন, 'জারের আমলে তার সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি—কারণ টলস্টয় আপন মতামত প্রকাশ করার সময় জারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেতেন। জারের পতনের পর নতুন সরকার এতদিন নানা জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল—এখন আস্তে আস্তে কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে নানা রহস্যের সমাধান হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা, আমি তো শুনেছি আপনারা আপনাদের প্রাকবলশেভিক সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত নন।'

মাদামের মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় ইংরেজের প্রোপাগান্ডা।'

আমি আমার ভুল খবরের জন্য হন্তদন্ত হয়ে মাপ চেয়ে বললুম, 'আমরা রাশান জানিনে, আমরা চেখফ পড়ি ইংরিজীতে, লাল রুশের নিন্দাও পড়ি ইংরিজীতে।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভাব দেখে বুঝলুম তিনি ইংরেজ কি করে না-করে, কি বলে না-বলে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আপন বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে যে অসত্য আপনার থেকে বিলোপ পাবে সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর মূল বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমরা এসেছিলুম চারটের সময়; তখন বাজে প্রায় সাতটা। এর মাঝে যে কত পাপিরসি পুড়ল, কত চা চলল গল্পের তোড়ে আমি কিছু-মাত্র লক্ষ্য করিনি। এক কাপ শেষ হতেই মাদাম সেটা তুলে নিয়ে এঁটো

www.MurchOna.com

চা একটা বড় পাত্রে ঢেলে ফেলেন, লিকার ঢেলে গরম জল মিশিয়ে চিনি দিয়ে আমার অজানতেই আরেক কাপ সামনে রেখে দেন। জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেন না কতটা লিকারের প্রয়োজন, দু-একবার দেখেই আমার পরিমাণটা শিখে নিয়েছেন। আমি কখনো ধন্যবাদ দিয়েছি, কখনো টলস্টয় গর্কির তর্কের ভিতরে ডুবে যাওয়ায় লক্ষ্য করিনি বলে পরে অনুতাপ প্রকাশ করেছি।

কথার ফাঁকে মাদাম বললেন, 'আপনারা এখানেই খেয়ে যান।' আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'আরেক দিন হবে।' বেনওয়া সায়েব তো ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আজ উঠি, বড্ড বেশীক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি।'

আমি একটু বোকা বনে গেলুম। পরে বুঝতে পারলুম বেনওয়া সায়েব খাওয়ার নেমন্তন্নটা অন্য অর্থে ধরে নিয়ে লজ্জা পেয়েছেন। মাদামও দেখি আস্তে আস্তে বেনওয়ার মনের গতি ধরতে পেরেছেন। তখন লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে বললেন, 'না মসিয়ো, আমি সে অর্থে বলিনি; আমি সত্যিই আপনাদের গালগল্পে ভারী খুশী হয়ে ভাবলুম দু'মুঠো খাবার জন্য কেন আপনাদের আড্ডাটা ভঙ্গ হয়।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভালো করে কুয়াশাটা কাটাবার জন্য বললেন, 'পশ্চিম ইয়োরোপীয় এটিকেটে এ-রকম খেতে বলার অর্থ হয়ত 'তোমরা এবার ওঠো, আমরা খেতে বসব।' আমার স্ত্রী সে ইঙ্গিত করেননি। জানেন তো খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমরা এখনো আমাদের কুর্তা পাতলুনের উপরে পরে থাকি—অর্থাৎ আমরা প্রাচ্যদেশীয়।'

সক্কলেই আরাম বোধ করলুম। কিন্তু সে যাত্রা ডিনার হল না। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেমিদফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি রাশান শেখেন না কেন?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি শেখাবেন?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়। **With pleasure!**'

বেনওয়া বললেন, '**No, not with pleasure**' বলে আমার দিকে চোখ ঠার দিলেন।

মাদাম বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

বেনওয়া বললেন, 'এক ফরাসী লন্ডনের হোটেলে ঢুকে বলল, '**Waiter, bring me a cotlette, please!**' ওয়েটার বলল, '**With pleasure, Sir.**' ফরাসী ভয় পেয়ে বলল, '**No, no, not with pleasure, with potatoes, please!**'

বেনওয়া বিদগ্ধ ফরাসী। একটুখানি হাল্কা রসিকতা দিয়ে শেষ পাতলা মেঘটুকু কেটে দিয়ে টুক করে বেরিয়ে এলেন।

www.MurchOna.com

মাদামও কিছু কম না। শেষ কথা শুনতে পেলুম 'But I Shall give you cotlettes with both pleasure and potatoes'.

রাস্তায় বেরিয়ে বেনওয়াকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'এ দুটি যথার্থ খাঁটীলোক।'

আঠাশ

হেমন্তের কাবুল 'মধ্যযুগীয় সম্প্রসারণে' ফুলে ওঠে, ইংরিজীতে যাকে বলে 'মিড্‌ল্‌ এজ স্প্রেড্‌।' অর্থাৎ ভুঁড়িটা মোটা হয়, চাল-চলন ভারিক্কীভরা।

যবগমের দানা ফুলে উঠল, আপেল ফেটে পড়ার উপক্রম, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত গ্রীষ্ম-ভর রোদ বাতাস বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে, হাওয়া বইলে ডাইনে বাঁয়ে নাচন তোলে না, ঠায় দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কাঁপে, না হয় থপ করে ডাল ছেড়ে গাছতলায় শুয়ে পড়ে। প্রথম নবান্ন হয়ে গিয়েছে, চাষীরাও খেয়েদেয়ে মোটা হয়েছে। শীতকাতুরেরা দুটো একটা ফালতো জামা পরে ফেঁপেছে, গাধাগুলো ঘাস খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠেছে, খড়-চাপানো গাড়ির পেট ফেটে গিয়ে এদিক ওদিক কুটোর নাড়ী ছড়িয়ে পড়ছে।

আর সফল হয়ে ফেঁপে ওঠার আসল গরিমা দেখা যায় সকাল বেলার শিশিরে। বেহায়া বড়লোকের মত কাবুল উপত্যকা কেবলি হীরের আংটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়,—ঝলমলানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

কিন্তু এ সব জেল্লাই কাবুল নদীর রক্তশোষণ করে। সাপের খোলসের মত সে নদী এখন শুকিয়ে গিয়েছে, বাতাস বইলে বুক চিরে বালু ওড়ে। মার্কস্‌ তো আর ভুল বলেননি, 'শোষণ করেই সবাই ফাঁপে।'

যে পাগমান পাহাড়ের বরফের প্রাসাদে কাবুল নদীর জৌলুশ সে তার নীল চুড়োগুলো থেকে এক একটা করে সব ক'টা বরফের সাদা টুপি খসিয়ে ফেলেছে। আকাশ যেন মাটির তুলনায় বড্ড বেশী বুড়িয়ে গেল—নীল চোখে ঘোলাটে ছানি পড়েছে।

পাকা, পচা ফলের গন্ধে মাথা ধরে; আফগানিস্থানের সরাইয়ের চতুর্দিক বন্ধ বলে দুর্গন্ধ যে রকম বেরতে পারে না, কাবুল উপত্যকার চারিদিকে পাহাড় বলে তেমনি পাকা ফল ফসলের গন্ধ সহজে নিষ্কৃতি পায় না। বাড়ির সামনে যে ঘূর্ণিবায়ু, খড়কুটো পাতা নিয়ে বাইরে যাবে বলে রওয়ানা দেয় সেও দেখি খানিকক্ষণ পরে ঘুরে ফিরে কোনো দিকে রাস্তা না পেয়ে সেই মাঠে ফিরে এসে সবসুদ্ধ নিয়ে থপ করে বসে পড়ে।

www.MurchOna.com

তারপর একদিন সন্ধ্যের সময় এল ঝড়! প্রথম ধাক্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলুম, মেলে দেখি শেলির 'ওয়েস্ট্ উইন্ড' কীটসের 'অটামকে' ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে,—সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ।' খড়কুটো, জমে-ওঠা পাতা, ফেলে-দেয়া কুলো সবাই চলল দেশ ছেড়ে মুহাজিরিন হয়ে। কেউ চলে সার্কাসের সঙের মত ডিগবাজি খেয়ে, কেউ হনুমানের মত লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে দিয়ে আর বাদবাকী যেন ধনপতির দল—প্রলেতারিয়ার আক্রমণের ভয়ে একে ওকে জড়িয়ে ধরে।

আধঘন্টার ভিতর সব গাছ বিলকুল সাফ।

সে কী বীভৎস দৃশ্য!

আমাদের দেশে বন্যার জল কেটে যাওয়ার পর কখনো কখনো দেখেছি কোনো গাছের শিকর পচে যাওয়ায় তার পাতা ঝরে পড়েছে—সমস্ত গাছ ধবলকুষ্ঠ রোগীর মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

এখানে সব গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে-নেঙ্গা সঙ্গীন আকাশের দিকে উঁচিয়ে।

দু'একদিন অন্তর অন্তর দেখতে পাই গোর দিতে মড়া নিয়ে যাচ্ছে। আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস কবলুম কোথাও মড়ক লেগেছে কিনা।

আবদুর রহমান বলল, 'না হুজুর, পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োরাও ঝরে পড়ে। এই সময়েই তারা মরে বেশী।'

খবর নিয়ে দেখলুম, শুধু আবদুর রহমান নয়, সব কাবুলীরই এই বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার রীতিমত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। তার জন্য দায়ী অবশ্য আবদুর রহমানই।

আমাকে খাইয়ে দাইয়ে সে রোজ রাত্রেই কোনো একটা কাজ নিয়ে আমার পড়ার ঘরের এক কোণে আসন পেতে বসে,—কখনো বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়ায়, কখনো চাল ডাল বাছে, কখনো কাঁকুড়ের আচার বানায় আর নিতান্ত কিছু না থাকলে সব ক'জোড়া জুতো নিয়ে রঙ লাগাতে বসে।

আবদুর রহমানের জুতো বুরুশ করার কায়দা মামুলী সায়ান্স নয়, অতি উচ্চাঙ্গের আর্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার অর্ধেক মেহন্নতে মোনালিসার ছবি আঁকা যায়।

প্রথম খবরের কাগজ মেলে তার মাঝখানে জুতো জোড়াটি রেখে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে। তারপর দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে যদি কোথাও শুকনো কাদা লেগে থাকে তাই ছাড়াবে। তারপর লাগাবে এঞ্জিনের পিস্টনের গতিতে বুরুশ। তারপর মেথিলেটেড স্পিরিটে নেকড়া ভিজিয়ে

www.MurchOna.com

বেছে বেছে যে সব জায়গায় পুরানো রঙ জমে গিয়েছে সেগুলো অতি সন্তর্পণে ওঠাবে। তারপর কাপড় ধোয়ার সাবানের উপর ভেজা নেকড়া চালিয়ে তাই দিয়ে জুতোর উপর থেকে আগের দিনের রঙ সরাবে। তারপর নির্বিকার চিত্তে আধঘন্টাটাক বসে থাকবে জুতো শুকোবার প্রতীক্ষায়—'ওয়াশের' আর্টিস্টরা যে রকম ছবি শুকোবার জন্য সবুর করে থাকেন। তারপর তার রঙ লাগানো দেখে মনে হবে প্যারিস-সুন্দরীও বুঝি এত যত্নে লিপস্টিক লাগান না—তখন আবদুর রহমানের ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, প্রশ্ন শুধোলে সাড়া পাবেন না। তারপর বাঁ হাত জুতোর ভিতর ঢুকিয়ে ডান হাতে বুরুশ নিয়ে কানের কাছে তুলে ধরে মাথা নিচু করে যখন ফের বুরুশ চালাবে তখন মনে হবে বেহালার ডাকসাইটে কলাবৎ সমে পেঁছিবার পূর্বে যেন দ'য়ে মজে গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছেন। তখন কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না, 'সাবাস' বললেও ওস্তাদ তেড়ে আসবেন।

সর্বশেষে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দেবে, মনে হবে দীর্ঘ অদর্শনের পরে প্রেমিক যেন প্রিয়ার চোখে মুখে, কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম দিন আমি আপন অজানাতে বলে ফেলেছিলুম 'সাবাস!'

একটি আট ন' বছরের মেয়েকে তারই সামনে আমরা একদিন কয়েকজন মিলে অনেকক্ষণ ধরে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিলুম—সে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। যখন সকলের বলা কওয়া শেষ হল তখন সে শুধু আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তবু তো আজ তেল মাখিনি।'

আবদুর রহমানের মুখে ঠিক সেই ভাব।

গোড়ার দিকে প্রায়ই ভেবেছি ওকে বলি যে সে ঘরে বসে থাকলে আমার অস্বস্তি বোধ হয়, কিন্তু প্রতিবারেই তার স্বচ্ছন্দ সরল ব্যবহার দেখে আটকে গিয়েছি। শেষটায় স্থির করলুম, ফার্সীতে যখন বলেছি এই দুনিয়া মাত্র কয়েকদিনের মুসাফিরী ছাড়া আর কিছুই নয় তখন আমার ঘরে আর সরাইয়ের মধ্যে তফাত কোথায়? এবং আফগান সরাই যখন সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতায় প্যারিসকেও হার মানায় তখন কমরেড আবদুর রহমানকে এঘর থেকে ঠেকিয়ে রাখি কোন হক্কের জোরে? বিশেষতঃ সে যখন আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাদামের খোসা ছাড়াতে পারে, তবে আমিই বা তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রাশান ব্যাকরণ মুখস্থ করতে পারব না কেন?

আবদুর রহমান ফরিয়াদ করে বলল, আমি যে মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে টেনিস খেলা কামিয়ে দিয়ে রাশান রাজদূতাবাসে খেলতে আরম্ভ করেছি সেটা ভালো কথা নয়।

www.MurchOna.com

আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, মুইন-উস্-সুলতানের কোর্টে টেনিসের বল যে রকম শক্ত, এক মুইন-উস্-সুলতানকে বাদ দিলে আর সকলের হৃদয়ও সে রকম শক্ত—রাশান রাজদূতাবাসের বল যে রকম নরম, হৃদয়ও সে রকম নরম।

আবদুর রহমান ফিসফিস করে বলল, 'আপনি জানেন না হুজুর, ওরা সব 'বেদীন, বেমজহব'।' অর্থাৎ ওদের সব কিছু 'ন দেবায়, ন ধর্মায়।'

আমি ধমক দিয়ে বললুম, 'তোমাকে ওসব বাজে কথা কে বলেছে?'

সে বলল, 'সবাই জানে, হুজুর; ওদেশে মেয়েদের পর্যন্ত হায়া-শরম নেই, বিয়ে-শাদী পর্যন্ত উঠে গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'তাই যদি হবে তবে বাদশা আমানউল্লা তাদের এদেশে ডেকে এনেছেন কেন?' ভাবলুম এই যুক্তিটাই তার মনে দাগ কাটবে সবচেয়ে বেশী।

আবদুর রহমান বলল, 'বাদশা আমানউল্লা তো—।' বলে থেমে গিয়ে চুপ করে রইল।

পরদিন টেনিস খেলার দু'সেটের ফাঁকে দেমিদফকে জানালুম, প্রলেতারিয়া আবদুর রহমান ইউ, এস, এস, আর সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করে। দেমিদফ বললেন, 'আফগানিস্থান সম্বন্ধে আমরা বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই। তবে তুর্কীস্থান অঞ্চলে আমাদের একটু আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছে বলে আমাদের চিন্তাপদ্ধতি কর্মধারা একটু অতিরিক্ত ঘোলাটে হয়ে আফগানিস্থানে পৌঁছচ্ছে। আমরা উপর থেকে তুর্কীস্থানের কাঁধে জোর করে নানা রকম সংস্কার চাপাতে চাইনে; আমরা চাই তুর্কীস্থান যেন নিজের থেকে আপন মঙ্গলের পথ বেছে নিয়ে বাকী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।'

দেমিদফের স্ত্রী বললেন, 'বুখারার আমীর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ শোষক সম্প্রদায় বলশেভিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যহারা হয়ে পালিয়ে এসে এখানে বাসা বেঁধেছে। তারা যে নানা রকম প্রোপাগান্ডা চালাতে কসুর করছে না, তা তো জানেনই।'

আমি কম্যুনিজমের কিছুই জানিনে, কিন্তু এঁদের কথা বলার ধরন, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞের প্রতি সহিষ্ণুতা, আপন আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে সত্যই মুগ্ধ করল।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করল রাজদূতাবাসের ভিতর এঁদের সামাজিক জীবন। অন্যান্য রাজদূতাবাসে বড়কর্তা, মেজকর্তা ও ভদ্রেতরজনে তফাত যেন গৌরীশঙ্কর, দুমকা পাহাড় আর উইয়ের ঢিপিতে। এখানে যে

www.MurchOna.com

কোনো তফাত নেই, সে কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, কিন্তু সে পার্থক্য কখনো রূঢ় কর্কশরূপে আমার চোখে ধরা দেয়নি।

কত অপরাহ্ণ, কত সন্ধ্যা কাটিয়েছি দেমিদফের বসবার ঘরে। তখন এম্বেসির কত লোক সেখানে এসেছেন, পাপিরসি টেনেছেন, গল্প-গুজব করেছেন। তাঁদের কেউ সেক্রেটারী, কেউ ডাক্তার, কেউ আফগান এয়ার ফোর্সের পাইলট—দেমিদফ স্বয়ং রাজদূতাবাসের কোষাধ্যক্ষ। সকলেই সমান খাতির-যত্ন পেয়েছেন; জিজ্ঞেস না করে জানবার কোনো উপায় ছিল না যে, কে সেক্রেটারি আর কে কেরানী।

খোদ অ্যামবেসডর অর্থাৎ রুশ রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রতিভূ তাভারিশ স্ট্রেঙ পর্যন্ত সেখানে আসতেন। প্রথম দর্শনে তো আমি বগদানফ সায়েবের তালিম মত খুব নীচু হয়ে ঝুঁকে শেকহ্যান্ড করে বললুম, 'I am honoured to meet Your Excellency!' কিন্তু আমার চোস্ত ভদ্রতায় একসেলেন্সি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে জোর হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতখানা তলোয়ারের মত এমনি ধারা চালালেন যে, আমার সমস্ত 'ভদ্রস্থতা' যেন দু'টুকরো হয়ে কার্পেটে লুটিয়ে পড়ল।

মাদাম দেমিদফ বললেন, 'ইনি রুশ সাহিত্যের দরদী।'

কোনো ইংরেজ বড়কর্তা হলে বলতেন, 'রিয়েলি? হাউ ইন্টারেস্টিঙ!' তারপর আবহাওয়ার কথাবার্তা পাড়তেন।

স্ট্রেঙ বললেন, 'তাই নাকি, তাহলে বসুন আমার পাশে, আপনার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা হবে।' আর সকলে তখন আপন আপন গল্পে ফিরে গিয়েছেন। স্ট্রেঙ প্রথমেই অসঙ্কোচে গোটাকয়েক চোখা চোখা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার বিদ্যের চৌহদ্দি জরিপ করে নিলেন। তারপর পুশকিনের গীতিকাব্য-রস আমাকে মূল থেকে আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলেন। যে অংশ বেছে নিলেন সে-ও ভারি মরমিয়া। ওনিয়েগিন সংসারে নানা দুঃখ, নানা আঘাত পেয়ে তাঁর প্রথমা প্রিয়ার কাছে ফিরে এসে প্রেম নিবেদন করছেন; উত্তরে প্রিয়া প্রথম যৌবনের নষ্ট দিবসের কথা ভেবে বলেছেন, 'ওনিয়েগিন, হে আমার বন্ধু, আমি তখন তরুণী ছিলুম, হয়ত সুন্দরীও ছিলুম'—

আমাদের দেশের রাধা যে রকম একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, আমার এই নতুন বয়সের কালে।'

আমি তন্ময় হয়ে শুনলুম। আবৃত্তি শেষ হলে ভাবলুম, বরঞ্চ একদিন শুনতে পাব স্বয়ং চার্চিল হেদোর পারে লঙ্কা-ঠাসা চীনেবাদাম খেয়ে সশব্দে ডাইনে বাঁয়ে নাম ঝাড়ছেন, কিন্তু মহামান্য বৃটিশ রাজদূত প্রথমদর্শনে অভ্যাগতকে কীটসের 'ইসাবেলা' শোনাচ্ছেন, এ যেন

www.MurchOna.com

'শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

ব্রিটিশ রাজদূতকে হামেশাই দেখেছি স্ট্রাইপ্ট ট্রাউজার আর স্প্যাট-পরা। ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে যেন স্বয়ং পঞ্চম জর্জের মামাতো ভাই। নিতান্ত দৈব দুর্বিপাকে এই দুশমনের পুরীতে বড় অনিচ্ছায় কাল কাটাচ্ছেন। 'কীটস্ কে, অথবা কারা ?—পিছনে যখন বহুবচনের 'এস্' রয়েছে ? পাসপোর্ট চায় নাকি ? বলে দাও, 'ওসব হবে-টবে না।'

এমন কি, ফরাসী রাজদূতকেও কখনো বগদানফের ঘরে আসতে দেখিনি। বেনওয়া তাঁর কথা উঠলেই বলতেন, 'কার কথা বলছেন ? মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ লিগেশন ইন মাবুল ? ম দিয়ো! উনি হচ্ছেন সিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ নিগেশন ইন মাবুল—'

'মাবুল' অর্থ অভিধানে লেখে, **Loony, off his nut !**

স্ট্রেঙ বললেন, 'তিনি রাজদূতাবাসের সাহিত্যসভাতে চেখফ সম্বন্ধে একখানা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। শুনে তো আমার চোখের তারা ছিটকে পড়ার উপক্রম। আরেকটা লিগেশনের কথা জানি, সেখানে চড়ুই পাখি শিকার সম্বন্ধে প্রবন্ধ চললেও চলতে পারে, কিন্তু চেখফ, বাই গ্যাড্, স্যার !'

আমি বললুম, 'রাশান শেখা হলে আপনার প্রবন্ধটি অনুবাদ করার বাসনা রাখি।'

স্ট্রেঙ বললেন, 'বিলক্ষণ ! আপনাকে একটা কপি পাঠিয়ে দেব। কোনো সত্ব সংরক্ষিত নয়।'

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলুম আর পাঁচজন তখন বড়কর্তার মুখের কথা লুফে নেবার জন্য চতুর্দিকে ঝুলে থাকেননি। ছোট্ট ছোট্ট দল পাকিয়ে সবাই আপন আপন গল্প নিয়ে মশগুল ছিলেন। আর সকলে কি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, ঠিক ঠিক বলতে পারিনে, তবে একটা কথা নিশ্চয় জানি যে, তাঁরা ড্রইংরুমে বসে চাকরের মাইনে, ধোপার গাফিলি আর মাখনের অভাব নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চালাতে পারেন না !

নিতান্ত ছোট জাত ! আর শুধু কি তাই; এমনি বজ্জাত যে, সে কথাটা ঢাকবার পর্যন্ত চেষ্টা করে না !

সাধে কি আর ইংরেজের সঙ্গে এদের মুখ-দেখা পর্যন্ত বন্ধ।

ইংরেজ তখন মস্কো-বাগে দূরবীন লাগিয়ে স্তালিন আর ত্রৎস্কি দলের মোষের লড়াই দেখেছে, আর দিন গুণছে ইউ, এস, এস, আর-এর তেরটা বাজবে কখন।

এ সব হচ্ছে ১৯২৭ সালের কথা।

www.MurchOna.com

উনত্রিশ

কবি বলেছেন, 'দীন যথা যায় দূরে তীর্থ দরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে।' আমানউল্লা ইয়োরোপ ভ্রমণে বেরলেন, আমিও শীতের দু'মাসের ছুটি পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু সত্যযুগ নয় বলে প্রবাদের মাত্র আধখানা ফলল—আমি ইয়োরোপ গেলুম না, গেলুম দেশ।

উল্লেখযোগ্য কিছুটা ঘটল না কিন্তু ভারতবর্ষে দেখি আমানউল্লার ইয়োরোপ ভ্রমণ নিয়ে সবাই ক্ষেপে উঠেছে। আমানউল্লার সম্মানে প্রাচ্য ভারতবাসী যেন নিজের সম্মান অনুভব করছে।

আমাকে ধরল হাওড়া স্টেশনে কাবুলী পাজামা আর পেশাওয়ারের টিকিট দেখে—হয়ত লাণ্ডিকোটাল থেকে খবরও পেয়েছিল। তন্ন তন্ন করে সার্চ করলো অনেকক্ষণ ধরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল তারও বেশীক্ষণ ধরে—যেন আমি মেকি সিকিটা। কিন্তু আমি যখন কাবুলের কাস্টম হৌসে তামিল পেয়েছি, তখন ধৈর্যে আমাকে হারাতে পারে কোন্ বাঙালী অফিসার। খালাস পেয়ে অজানাতে তব, বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা গেরো রে বাবা।'

বাঙালী অফিসার চমকে উঠলেন, বললেন, 'দাঁড়ান, আপনি বাঙালী, তাহলে আরো ভালো করে সার্চ করি।'

বললুম, 'করুন, আমার নাম কমলাকান্ত।'

দেশে পৌঁছে মাকে দিলুম এক সুটকেসভর্তি বাদাম, পেস্তা—অষ্ট গন্ডা পয়সা খরচ করে কাবুল শহরে কেনা। মা পরমানন্দে পাড়ার সবাইকে বিলোলেন। পাড়াগাঁয়ে যে বোনটির বিয়ে হয়েছিল, সে-ও বাদ পড়ল না।

কিন্তু থাক। সাত মাস কাবুলে কাটিয়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি যে, বাঙালী কাবুলীর চেয়ে ঢের বেশী হুঁশিয়ার! তারা যে আমার এ-বই পয়সা খরচ করে কিনবে, সে আশা কম। তাই ভাবছি, এ'দুমাসের গর্ভাঙ্কটা 'সফর-ই হিন্দ' নাম দিয়ে ফার্সীতে ছাপাবো। তাই দিয়ে যদি দু'পয়সা হয়। কাবুলী কিনুক আর নাই কিনুক, উদ্দমটার প্রশংসা নিশ্চয়ই করবে। কারণ ফার্সীতেই প্রবাদ আছে—

'খর বাশ ও খুক বাশ ও ইয়া সগে মুরদার বাশ।
হরচে বাশী বাশ আম্মা আন্দকী জরদার বাশ॥'

'হও না গাধা, হও না শূয়র, হও না মরা কুকুর।
যা ইচ্ছে হও কিন্তু রেখো রত্তি সোনা টুকুর॥'

www.MurchOna.com

ত্রিশ

ফিরে দেখি সর্বত্র বরফ, দোরের গোড়ায় আবদুর রহমান আর ঘরের ভিতর গনগনে আগুন। আমি তখন শীতে জমে গিয়েছি।

আবদুর রহমান হাসিমুখে আমার হাতে চুমো খেল, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। 'দাঁড়ান হুজুর' বলে আমাকে কোলে করে এক লাফে উঠানে নেবে গেল। এক মুঠো পেঁজা বরফ হাতে নিয়ে আমার নাক আর কানের ডগা সেই বরফ দিয়ে ঘন ঘন ঘষে আর ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে 'চিন্ চিন্' করছে কিনা। আমি ভাবলুম, এও বুঝি পানশিরের কোনো জঙ্গলী অভ্যর্থনার আদিখ্যেতা। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'চল, চল, ঘরের ভিতর চল, শীতে আমার হাড়মাস জমে গিয়েছে।' আবদুর রহমান কিন্তু তখন তার শালপ্রাংশু মহাবাহু দিয়ে আমাকে এমনি জড়িয়ে ধরে দু'কানে বরফ ঘষছে যে, আমি কেন, কিঙ্কড় সিংয়েরও সাধ্যি নেই যে, সে-ব্যূহ ছিন্ন করে বেরতে পারে। আবদুর রহমান শুধু বরফ ঘষে আর একটানা মন্ত্রোচ্চারণের মত শুধায়, 'চিন্ চিন্ করছে, চিন্ চিন্ করছে?' শেষটায় অনুভব করলুম সত্যই নাক আর কানের ডগায় ঝিঁ ঝিঁ ছাড়ার সময় যে রকম চিন্ চিন্ করে সে রকম হতে আরম্ভ করেছে। আবদুর রহমানকে সে খবরটা দেওয়া মাত্রই সে আমাকে কোলে করে আরেক লাফে ঘরে ঢুকল, কিন্তু বসাল আগুন থেকে দূরে ঘরের আরেক কোণে। রোদে-পোড়া মোষ যে রকম কাদার দিকে ধায়, আমিও সেই রকম আগুনের দিকে যতই ধাওয়া করি, আবদুর রহমান ততই আমাকে ঠেকিয়ে রেখে বলে, 'সর্বাঙ্গে রক্ত চলাচল শুরু হোক, হুজুর, তারপর যত খুশী আগুন পোয়াবেন!'

ততক্ষণে সে আমার জুতো খুলে পায়ের আঙুলগুলো পরখ করে দেখছে সেগুলোর রঙ কতটা নীল। আবদুর রহমানের চেহারা থেকে আন্দাজ করলুম নীল রঙের প্রতি তার গভীর বিতৃষ্ণা। ঘষে ঘষে আঙুলগুলোকে যখন বেশ বেগুনী করে ফেলল তখন সে চেয়ারসুদ্ধ আমাকে আগুনের পাশে এনে বসাল। আমি ততক্ষণে দস্তানা খুলতে গিয়ে দেখি কমলী ছোড়তে চায় না,—আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গিয়েছে। দুষ্টু ছেলে যেরকম খাওয়ার সময় মাকে পেট কামড়ানোর খবর দেয় না আমিও ঠিক সেই রকম আঙুল ফোলার খবরটা চেপে গেলুম। সরল আবদুর রহমান ওদিকে আমার পায়ের তদারক করছে, আমি এদিকে আগুনের সামনে হাত বাড়িয়ে আরাম করে দেখি, কলাগাছ বটগাছ হতে

www.MurchOna.com

চলেছে। ততক্ষণে আবদুর রহমান লক্ষ্য করে ফেলেছে যে, আমার হাত তখনো দস্তানা-পরা। টমাটোর মত লাল মুখ করে আমাকে শুধাল, 'হাতের আঙুলও যে জমে গিয়েছে সে কথাটা আমায় বললেন না কেন ?' এই তার প্রথম রাগ দেখলুম। ভৃত্য আবদুর রহমানের গলায় আমীর আবদুর রহমানের গলা শুনতে পেলুম। আমি চিঁ চিঁ করে কি একটা বলতে যাচ্ছিলুম। আমার দিকে কান না দিয়ে বলল, 'চা খাওয়ার পরও যদি দস্তানা না খোলে তবে আমি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলব !'

আমি শুধালুম, 'কি কাটবে ? হাত না দস্তানা ?'

আবদুর রহমান অত্যন্ত বেরসিক। আমি আরো ঘাবড়ে গেলুম।

কিন্তু শুধু আমিই ঘাবড়াইনি। দস্তানা পর্যন্ত আবদুর রহমানের গলা শুনে বুঝতে পেরেছে যে, সে চটে গেলে দস্তানা, দস্ত কাউকে আস্ত রাখবে না। চায়ের পেয়ালায় হাত দেবার পূর্বেই অক্টোপাশের পঞ্চপাশ খসে গেল।

সে রাত্রে আবদুর রহমান আমাকে সাত-তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে আপন হাতে বিছানায় শুইয়ে দিল। লেপের তলায় আগেই গরম জলের বোতল ফ্ল্যানেলে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটাতে পা ঠেকিয়ে আমি মুনি-ঋষিদের সিংহাসনে পদাঘাত করার সুখ অনুভব করলুম। পেটের ভিতর চর্বির ঘন শুরুয়া, লেপে চাপা গরম বোতলের ওম, আর আবদুর রহমানের বাঘের থাবার ডলাই-মলাই তিনে মিলে এক পলকেই চোখের পলক বন্ধ করে ফেলেছিলুম।

সমস্ত কাহিনীটি যে এত বাখানিয়া বললুম তার প্রধান কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বই কোনো দিন কারো কোনো কাজে লাগবে না। আর আজকের দিনের ভরত-দন্ডিন্, কম্যুনিস্টরা বলেন, যে-আর্ট কাজে লাগে না সে-আর্ট আর্টই নয়। অর্থাৎ শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি দেয়লো মশারির পেরেক পোঁতা না যায় তবে সে শিবলিঙ্গের 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

তবু যদি কোনো দিন পাকচক্রে ফ্রস্টবিট্ন্ হন তবে প্রলেতারিয়ার প্রতীক ওঝা আবদুর রহমানকে স্মরণ করে তার দাওয়াই চালাবেন। সেরে উঠবেন নিশ্চয়ই, এবং তখন যেন আপনার কৃতজ্ঞতা আবদুর রহমানের দিকে ধায়। আবদুর রহমানের প্রাপ্য প্রশংসা আমি কেতাবের মালিকরূপে কেড়ে নিয়ে 'শোষক,' 'বুর্জুয়া' নামে পরিচিত হতে চাইনে।

পরদিন সকালবেলা দেখি, তিন মাইল বরফ ভেঙ্গে বৃদ্ধ মীর আসলম এসে উপস্থিত; বললেন, 'আত্মজনের বাচনিক অবগত হইলাম তুমি কল্য রজনীর প্রথম যামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। কুশল-সন্দেশ কহ। শৈত্যাধিক্যে পথমধ্যে অত্যধিক ক্লেশ হয় নাই তো ?'

www.MurchOna.com

আমি আবদুর রহমানের কবিরাজির সালঙ্কার বর্ণনা দিলে মীর আসলম বললেন, 'নাতিদীর্ঘদিবস তথা শর্বরীর প্রথম যামই সুতশ্চল-শকটারোহীকে শিশির-বিদ্ধ করিতে সক্ষম। কৃশানুসংশ্রব হইতে রক্ষা করিয়া তোমার পরিচারক বিচক্ষণের কর্ম করিয়াছে। অপিচ লক্ষ্য করো নাই, সুদেশে আতপতাপে দগ্ধ হইয়া সুগৃহে প্রত্যাবর্তন মাত্রই সুশীলা জননী তদ্দণ্ডেই শীতল জল পান করিতে নিষেধ করেন, অবগাহনকক্ষ উন্মোচন করেন না ? সঙ্কটদ্বয় আয়ুর্বেদের একই সূত্রে গ্রথিত।'

হক্ কথা।

বললুম, 'ইয়োরোপে আমানউল্লার সমৃদ্ধনা নিয়ে হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমান বড়ই গর্ব অনুভব করছে।'

মীর আসলম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বিদেশে সম্মান-প্রাপ্ত নৃপতির সম্মান সুদেশে লাঘব হয়।'

এ যেন চাণক্য-শ্লোকের তৃতীয় ছত্র। ভাবলুম, জিজ্ঞেস করি, মহাশয় ভারতবর্ষে কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, মুসলমানী না হিন্দুয়ানী, কিন্তু চেপে গিয়ে বললুম, 'আমানউল্লা বিদেশে সম্মান পাওয়াতে সুদেশে সংস্কার কর্ম করবার সুবিধা পাবেন না ?'

মীর আসলম বললেন, 'সংস্কার-পঙ্কে যে নৃপতি কণ্ঠমগ্ন, বৈদেশিক সম্মানমুকুটের গুরুভার তাঁহাকে অধিকতর নিমজ্জিত করিবে।'

আমি বললুম, 'রানী সুরাইয়াকে দেখবার জন্য প্যারিসের ছেলে-বুড়ো পর্যন্ত রাস্তায় ভিড় করে ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মীর আসলম বললেন, 'ভদ্র, অদ্য যদি তুমি তোমার পদদ্বয়ের ব্যবহার পরিত্যাগপূর্বক মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হও, তবে তোমার মত সুল্প-পরিচিত মনুষ্যেরও এবম্বিধ বাতুলতা নিরীক্ষণ করিবার জন্য কাবুলহট্ট সম্মিলিত হইবে।'

আমি বললুম, 'কী মুশকিল, তুলনাটা আদপেই ঠিক হল না; রানী তো আর কোনোরকম পাগলামি করছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'মুসলমান রমণীর পক্ষে তুমি অন্য কোন্ বাতুলতা প্রত্যাশা করো ? অবগুন্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রশস্ত রাজবর্ত্মে কোন্ মুসলমান রমণী এবম্বিধ অশাস্ত্রীয় কর্ম করিতে পারে ?'

আমি বললুম, 'আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী কুরান-হদীস পড়েছেন; মুখ দেখানো তো আর কুরান-হদীসে বারণ নেই।'

মীর আসলম বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে অবান্তর। পার্বত্য উপজাতির শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে প্রযোজ্য। তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।'

www.MurchOna.com

আমি আলোচনাটা হাল্কা করবার জন্য বললুম, 'জানেন, ফরাসী ভাষায় 'সুরীর' শব্দের অর্থ 'মৃদু হাস্য'। রানী সুরাইয়ার নাম তাই প্যারিসের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়াছে।'

মীর আসলম বললেন, 'আমীর হবীবউল্লার নামের অর্থ 'প্রিয়তম বান্ধব'; ইংরেজ শতবার এই শব্দার্থের প্রতি আমীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করত শপথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যখন শত্রুহস্তের লৌহকীলক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, তখন হবীবউল্লার কোন্ 'হবীব' তাঁহাকে স্মরণ করিল? অপিচ, হবীবউল্লার হবীববর্গই তাঁহাকে পুলসিরাতের (বৈতরণীর) প্রান্তদেশে অকারণে, অসময়ে দন্ডায়মান করাইয়া দিল।'

আমি বললুম, 'ও তো পুরানো কাসুন্দি। কিন্তু ঠিক করে বলুন তো আপনি কি আমানউল্লার সংস্কার পছন্দ করেন না?'

বললেন, 'বৎস, গুরুর পদসেবা করিয়া আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমি শিক্ষাসংস্কারের বিরুদ্ধে কেন দন্ডায়মান হইব? কিন্তু আমানউল্লা যে ফিরিঙ্গী-শিক্ষা প্রবর্তনাভিলাষী আমি তাহা ভারতবর্ষে দর্শন করিয়া ঘৃণাবোধ করিয়াছি। কিন্তু ভদ্র, তোমার সুমিষ্ট চৈনিক যুষ পরিত্যাগ করিয়া এই তিক্ত বিষয়ের আলোচনায় কি লভ্য? যুষপত্র কি তুমি সুদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছ? গুরুগৃহের সুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে।'

আমি বললুম, 'আপনার জন্যও এক প্যাকেট এনেছি।'

মীর আসলম সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু ভদ্র, শুল্কদ্ধর-ণিকের ন্যায্য প্রাপ্য অর্পণ করিয়াছ সত্য?'

আমি বললুম, 'আপনার কোনো ভয় নেই। কাবুল কাস্টম হৌসকে ফাঁকি দেবার মত এলেম আমার পেটে নেই। বিছানার ছারপোকাকে পর্যন্ত সেখানে পাশপোর্ট দেখাতে হয়, মাশুল দিতে হয়। আমি তাদের সব অন্যায্য দাবী-দাওয়া কড়ায়-গন্ডায় শোধ করেছি। আপনাকে হারাম খাইয়ে আমি কি আখেরে জাহান্নমে যাব?'

মীর আসলম আমাকে শীতকালে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হতে হয় সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, আবদুর রহমানকে ডেকে ঘৃতলবণতৈলতন্ডুলবস্ত্রইন্ধন সম্বন্ধে নানা সুযুক্তি দিয়ে বিদায় নিলেন।

খবর পেয়ে তারপর এলেন মৌলানা। আমি আমানউল্লার বিদেশে সম্মান পাওয়া, আর সে সম্বন্ধে মীর আসলমের মন্তব্য তাঁকে বললুম। মৌলানা বললেন, 'আমানউল্লা যাদের কথায় চলেন, তারা তো বাদশাহের সম্মানে নিজেদের সম্মানিত মনে করছে। তারা বলছে, 'মুস্তফা কামাল যদি তুর্কীকে, রেজা শাহ যদি ইরানকে প্রগতির পথে চালাতে পারেন,

www.MurchOna.com

তবে আমানউল্লাই বা পারবেন না কেন ?' এই হল তাদের মনের ভাব; কথাটা খুলে বলার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। কারণ কোনো রকম বাধাও তো কেউ দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু মৌলানা, কতকগুলো সংস্কারের প্রয়োজন আমি মোটেই বুঝে উঠতে পারিনে। এই ধরো না শুক্রবারের বদলে বৃহস্পতি-বার ছুটির দিন করা।'

মৌলানা বললেন, 'শুক্রবার ছুটির দিন করলে জুম্মার নমাজের হিড়িকে সমস্ত দিনটা কেটে যায়, ফালতো কাজ-কর্ম করার ফুরসত পাওয়া যায় না। তাই আমানউল্লা দিয়েছেন সমস্ত বৃহস্পতিবার দিন ছুটি, আর শুক্রবারে জুম্মার নমাজের জন্য আধ ঘন্টার বদলে ১ ঘন্টার ছুটি। কিন্তু জানো, আমি আরেকটা কারণ বের করেছি। এই দেখ না অ্যারোপ্লেনে করে যদি তুমি শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন বুধবার বেরোও, এখানে পেঁছিবে ছুটির দিন বৃহস্পতিবারে, তারপর ইরাক পেঁছিবে শুক্রবারে সেও ছুটির দিন, তারপরের দিন প্যালেস্টাইনে—সেখানে ইহুদীদের জন্য শনিবারে ছুটি, তারপরের দিন রবিবারে ইয়োরোপ, তারপরের দিন সাউথ-সী আয়লেন্ডে, সেখানে তো তামাম হপ্তা ছুটি।'

আমি বললুম, 'উত্তম আবিষ্কার করেছ, কিন্তু বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছ তো ? না হলে বরফ ভেঙ্গে কাবুলে ফিরবে কি করে ?'

মৌলানা বললেন, 'দু'-একদিনের মধ্যেই বরফের উপর পায়েচলার পথ পড়ে যাবে; আসতে যেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমি চললুম দেশে, বউকে নিয়ে আসতে। বেনওয়া সায়েব মত দিয়েছেন, তুমি কি বল ?'

আমি শুধালুম, 'বউ রাজী আছেন ?'

মৌলানা বললেন, 'হুঁ।'

আমি বললুম, 'তবে আর কাবুল-অমৃতসরে প্লেবিসিট্ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? তোমাদেরই ভাষায় তো রয়েছে বাপ,

'মিয়া বিবি রাজী
কিয়া করে কাজী ?'

মনে মনে বললুম, 'বগদানফ গেছেন, তোমার দাড়িটির দর্শনও এখন আর কিছুদিনের তরে পাব না। নতুন বউয়ের 'কা তব কান্তা' হতে অন্তত ছ'টি মাস লাগার কথা।'

মৌলানা চলে যাওয়ার পর আবদুর রহমানকে ডেকে বললুম, 'দাও

www.MurchOna.com

তো হে কুর্সিখানা জানালার কাছে বসিয়ে; বাকী শীতটা তোমার ঐ বরফ দেখেই কাটাব।'

আবদুর রহমানের বর্ণনামাফিক সব রকমেরই বরফ পড়ল। কখনো পেঁজা পেঁজা, কখনো গাদা গাদা, কখনো ঘূর্ণিবায়ুর চক্কর খেয়ে দশদিক অন্ধকার করে, কখনো আসন্ন যবনিকার মত গিরিপ্রান্তর ঝাপসা করে দিয়ে; কখনো অতি কাছে আমারই বাতায়ন পাশে, কখনো বহুদূরে সানুশিখর হয়ে, শিখর চুম্বন করে। আস্তে আস্তে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল, শুধু পত্রাবর্জিত চিনার গাছের সারি দেখে মনে হয় দাঁত ভাঙা পুরানো চিরুনিখানা ঠাকুরমা যেন দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রেখে বরফের পাকা চুল এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আবদুর রহমান মর্মাহত। আমাকে প্রতিবার চা দেবার সময় একবার করে বাইরের দিকে তাকায় আর আর্তস্বরে বলে, 'না হুজুর, এ বরফ ঠিক বরফ নয়। এ শহুরে বরফ, বাবুয়ানী বরফ। সত্যিকার খাঁটী বরফ পড়ে পানশিরে। চেয়ে দেখুন বরফের চাপে এখনো গেট বন্ধ হয়নি। মানুষ এখনো দিব্যি চলাফেরা করছে, ফেঁসে যাচ্ছে না।'

আবদুর রহমানের ভয়, পাছে আমাকে বোকা পেয়ে কাবুল উপত্যকা তার ভেজাল বরফ গছিয়ে দেয়। নিতান্তই যদি কিনতে হয় তবে যেন আমি কিনি আসল, খাঁটী মাল 'মেড্ ইন পানশির।'

একত্রিশ

শীত আর বসন্ত ঘরে বসে, ডুব সাঁতার দিয়ে কাটাতে হল।

এদেশে বসন্তের সঙ্গে আমাদের বর্ষার তুলনা হয়। সেখানে গ্রীষ্মকালে ধরণী তপ্তশয়নে পিপাসার্তা হয়ে পড়ে থাকেন, আষাঢ়স্য যে কোনো দিবসেই হোক্ ইন্দ্রপুরীর নববর্ষণ বারতা পেয়ে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হন। এখানে শীতকালে ধরিত্রী প্রাণহীন স্পন্দন-বিহীন মহানিদ্রায় লুটিয়ে পড়েন, তারপর নববসন্তের প্রথম রৌদ্রে চোখ মেলে তাকান। সে তাকানো প্রথম ফুটে ওঠে গাছে গাছে।

দূর থেকে মনে হল ফ্যাকাশে সাদা গাছগুলোতে বুঝি কোনোরকম সবুজ পোকা লেগেছে। কাছে গিয়ে দেখি গাছে গাছে অগুণতি ছোট্ট ছোট্ট পাতার কুঁড়ি; জন্মের সময় কুকুরছানার বন্ধ চোখের মত। তারপর কয়েকদিন লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখি সেগুলো ফুটেছে আর দুটি দুটি করে পাতা ফুটে বেরিয়েছে—গাছগুলো যেন সমস্ত শীত-

www.MurchOna.com

কাল বকপাখির মত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ ডানা মেলে ওড়বার উপক্রম করেছে। সহস্র সহস্র সবুজ বলাকা যেন মেলে ধরেছে লক্ষ লক্ষ অঙ্কুরের পাখা।

ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর।

গাছে গাছে দেখন-হাসি, পাতায় পাতায় আড়াআড়ি—কে কাকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে। কোনো গাছ গোড়ার দিকে সাড়া দেয়নি, হঠাৎ একদিন একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ মেলে দেখে আর সবাই ঢের এগিয়ে গেছে, সে তখন এমনি জোর ছুট লাগাল যে, দেখতে না দেখতে আর সবাইকে পিছনে ফেলে, বাজী জিতে, মাথায় আইভি মুকুট পরে সগর্বে দুলতে লাগল। কেউ সারা গায়ে কিছু না পরে শুধু সবুজ মুকুট পরল, কেউ ধীড়েসুস্থে সর্বাঙ্গে যেন চন্দনের ফোঁটা পরতে লাগল। এতদিন বাতাস শুকনো ডালের ভিতর দিয়ে হুহু করে ছুটে চলে যেত, এখন দেখি কী আদরে পাতাগুলোর গায়ে ইনিয়ে বিনিয়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

কাবুল নদীর বুকের উপর জমে-যাওয়া বরফের জগদ্দল-পাথর ফেটে চৌচির হল। পাহাড় থেকে নেমে এল গম্ভীর গর্জনে শত শত নব জলধারা—সঙ্গে নেমে আসছে লক্ষ লক্ষ পাথরের নুড়ি আর বরফের টুকরো। নদীর উপরে কাঠের পুলগুলো কাঁপতে আরম্ভ করেছে—সিকন্দর শাহের আমল থেকে তারা হাঁটু ভেঙে, কতবার নুয়ে পড়েছে, ভেসে গিয়েছে, ফের দাঁড়িয়ে উঠেছে তার হিসেব কেউ কখনো রাখতে পারেনি।

উপরে তাকিয়ে দেখি গভীর নীলামুজের মত নবীন নীলাকাশ হংসশুভ্র মেঘের ঝালর ঝুলিয়ে চন্দ্রাতপ সাজিয়েছে।

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি সবুজের বন্যায় জনপদ অরণ্য ডুবে গিয়েছে। এ রকম সবুজ দেখেই পূর্ববঙ্গের কবি প্রিয়ার শ্যামল রঙের স্মরণে বলেছিলেন,

ও বন্ধুয়া, কোন্ বন-ধোওয়া ছাঁওলা নীলা পানি,
গোসল করি হইলা তুমি সকল রঙের রানী।

কিন্তু এ-উপত্যকা এ-বনরাজি এ-রকম সবুজ পেল কোথা থেকে ?

নীলাকাশের নীল আর সোনালীর রোদের হলদে মিশিয়ে।

কিন্তু আমাদের বর্ষা আর এদেশের বসন্তে একটা গভীর পার্থক্য রয়েছে। বর্ষায় আমাদের মন ঘরমুখো হয়, এদেশের জনপ্রাণীর মন বাহিরমুখো হয়। গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে সুপ্তোত্থিত নব যৌবনের স্পন্দন অনুভব করে তারই স্মরণে কবি বলেছেন—

শপথ করিনু রাত্রে পাপ পথে আর যেন নাহি ধায়,
প্রভাতে দ্বারেতে দেখি শপথঘা মধুঋতু কি করি উপায়।

www.MurchOna.com

শুধু ওমর খৈয়াম দোটানার ভিতর থাকা পছন্দ করেন না। তিনি গর্জন করে বলেছেন,—

বিধিবিধানের শীত পরিধান
ফাগুন আগুনে দহন করো।
আয়ুবিহঙ্গ উড়ে চলে যায়
হে সাকি, পেয়ালা অধরে ধরো।*

কাবুলীরা তাই বেরিয়ে পড়েছে, না বেরিয়ে উপায়ও নেই—শীতের জ্বালানী কাঠ ফুরিয়ে এসেছে, দুমবা ভেড়ার জাবনা তলায় এসে ঠেকেছে, শুটকি মাংসের পোকা কিলবিল করছে। এখন আতপ্ত বসন্তের রোদে শরীরকে কিঞ্চিৎ তাতানো যায়, দুমবা ভেড়া কচি ঘাসে চরানো যায় আর আধখেঁচড়া শিকারের জন্য দু'চার দল পাখিও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। আবদুর রহমান বললো, পানশির অঞ্চলে ভাঙা বরফের তলায় কি এক রকমের মাছও নাকি এখন ধরা যায়। অনুমান করলুম, কোন রকমের স্প্রিং ট্রাউটই হবে।

রথ দেখার সময় যাঁরা কলা বেচার দিকেও মাঝে মাঝে নজর দেন তাঁদের মুখে শুনেছি কুবের যে যক্ষকে ঠিক একটি বৎসরের জন্যই নির্বাসন দিয়েছিলেন তার একটা গভীর কারণ আছে। ছয় ঋতুতে ছয় রকম করে প্রিয়ার বিরহযন্ত্রণা ভোগ না করা পর্যন্ত মানুষ নাকি পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ-বেদনার স্বরূপ চিনতে পারে না; আর বিদগ্ধজনকে এক বছরের বেশী শাস্তি দেওয়াতেও নাকি কোনো সূক্ষ্ম চতুরতা নেই—সোজা বাঙলায় তখন তাকে বলে মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া মাত্র।

আফগান সরকার অযথা বিঘ্ন-সন্তোষী নন বলে ছয়টি ঋতু পূর্ণ হওয়া মাত্রই আমাকে পান্ডববর্জিত গন্ডগ্রামের নির্বাসন থেকে মুক্তি দিয়ে শহরে চাকরী দিলেন। এবারে বাসা পেলুম লব-ই-দরিয়ায় অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে, রাশান দূতাবাসের গা ঘেঁষে, বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে একই বাড়িতে।

প্রকান্ড সে বাড়ি। ছোটখাটো দুর্গ বললেও ভুল হয় না। চারদিকে উঁচু দেয়াল, ভিতরে চকমেলানো একতলা দোতলা নিয়ে ছাব্বিশখানা বড় বড় কামরা। মাঝখানের চত্বরে ফুলের বাগান, জলের ফোয়ারাটা পর্যন্ত বাদ যায়নি। বড় লোকের বাড়ি সরকারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে—বেনওয়া সায়েব ফন্দি-ফিকির করে বাড়িটা বাগিয়েছিলেন।

আমি নিলুম এক কোণে চারটে ঘর আর বেনওয়া সায়েব রইলেন আরেক কোণে আর চারটে ঘর নিয়ে। বাকী বাড়িটা খাঁখাঁ করে, আর সে

* অনুবাদকের নাম মনে নেই বলে দুঃখিত।

www.MurchOna.com

এতই প্রকান্ড যে আবদুর রহমানের সঙ্গীত রবও কায়ক্লেশে আঙ্গিনা পাড়ি দিয়ে ওপারে পেঁছিয়।

শহরে এসে গুষ্ঠিসুখ অনুভব করার সুবিধে হল। রাশান রাজদূতাবাসে রোজই যাই—দু'দিন না গেলে দেমিদফ এসে দেখা দেন।—সইফুল আলম মাঝে মাঝে ঢুঁ মেরে যান, সোমথ বউ সমন্ধে অহরহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মৌলানার দাড়ির দর্শনও মাঝে মাঝে পাই, দোস্ত মুহম্মদ ঘূর্ণিবায়ুর মত বেলা-অবেলায় চক্কর মেরে বেরবার সময় 'কলাডা মুলাডা' ফেলে যান, বিদগ্ধ মীর আসলম সুসিদ্ধ চৈনিক যুষ পান করে যান, তা ছাড়া ইনি উনি তিনি তো আছেনই আর নিতান্ত বান্ধব বাড়ন্ত হলে বিরহী যক্ষ বেনওয়া তো হাতের নাগাল।

রাশান রাজদূতাবাসে আরো অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল; দেমিদফকে বাদ দিলে সকলের পয়লা নাম করতে হয় বলশফের। নামের সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে তাঁর দেহ—বৃঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশুমহাবাহু বললে আবদুর রহমান বরঞ্চ অপাংক্তেয় হতে পারে, ইনি সে বর্ণন। গলাধঃকরণ করে অনায়াসে সেকেন্ড হেল্‌পিঙ চাইতে পারেন।

আবদুর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময় যে দ্বিতীয় নর-দানবের কথা বলেছিলুম ইনিই সে-বিভীষিকা।

বহুবার এঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি—কাবুল বাজারের মত পপুলার লীগ অব নেশনসে আজ পর্যন্ত এমন দিশী বিদেশী চোখে পড়েনি যে তাঁকে দেখে হকচকিয়ে যায়নি।

হুঁশিয়ার সোয়ার হলে তক্ষুনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে—বহু ঘোড়াকে ঘাবড়ে গিয়ে সামনের পা দুটো আকাশে তুলতে দেখেছি।

টেনিস-কোর্টে রেকেট নিয়ে নামলে শত্রুপক্ষ বেজ-লাইনের দশ হাত দূরে তারের জালের গা ঘেঁষে দাঁড়াত। বলশফ বেজে দাঁড়ালে তাঁর কোনো পার্টনার নেটে দাঁড়াতে রাজী হত না, শত্রুপক্ষের তো কথাই ওঠে না। তাঁতের রেকেট ঘন ঘন ছিঁড়ে যেত বলে অ্যালুমিনিয়ম জাতীয় ধাতুর রেকেট নিয়ে তিনি তাড়ু হাঁকড়াতেন, সচ্ছন্দে নেট ডিঙোতে পারতেন—লাফ দেবার প্রয়োজন হত না—আর ঝোলা নেট টাইট করার জন্য এক হাতে হ্যান্ডেল ঘোরাতেন মেয়েরা যেরকম সেলাই কলের হাতল ঘোরায়।

শুনেছি বিলেতে কোনো কোনো ফিল্মে নাকি ষোলো বছরের কম বয়স হলে দেখতে দেয় না—চরিত্র দোষ হবে বলে; যাদের ওজন এক শ' ষাট পৌন্ডের কম তাদের ঠিক তেমনি বলশফের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করা বারণ ছিল, পাছে হাতের নড়া কাঁধ থেকে খসে যায়। মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

www.MurchOna.com

বীরপুরুষ হিসেবে রাশান রাজদূতাবাসে বলশফের খাতির ছিল। ১৯১৬ সাল থেকে বলশেভিক বিদ্রোহের শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে বিদেশে বিস্তর লড়াই লড়েছেন। ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে যখন রুশবাহিনী পোল্যান্ডে লড়াই হেরে পালায় তখন বলশফ রাশান ক্যাভালরিতে ছোকরা অফিসার। সেবারে ঘোড়ায় চড়ে পালাবার সময় তার পিঠের চোদ্দ জায়গায় জখম হয়েছিল—বিস্তর ঝুলোঝুলির পর একদিন শার্ট খুলে তিনি আমায় দাগগুলো দেখিয়েছিলেন। কোনো কোনোটা তখনো আধ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'পৃষ্ঠে তব অস্ত্র-লেখা।'

বলশফকে কেউ কখনো চটাতে পারেনি বলেই রসিকতাটা করেছিলুম। তিনি ভারতবর্ষের ক্ষাত্র বীরত্বের, 'কোড্' শুনে বললেন, 'যদি সেদিন না পালাতুম তবে ত্রংস্কির আমলে পোলদের বেধড়ক পাংটা মার দেবার সুখ থেকে যে বঞ্চিত হতুম, তার কি?'

মাদাম দেমিদফ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আর জানেন তো, মসিয়ো, ঐ লড়াইতেই সোভিয়েট রাশার অনেক পথ সুরাহা হয়ে যায়।'

বলশফের একটা মস্ত দোষ দুদন্ড চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। হাত দুখানা নিয়ে যে কি করবেন ঠিক করতে পারেন না বলে এটা সেটা নিয়ে সব সময় নাড়াচাড়া করেন, বেখেয়ালে একটু বেশী চাপ দিতেই কর্কস্ক্রুটা পর্যন্ত ভেঙে যায়। তিনি ঘরে ঢুকলেই আমরা টুকিটাকি সব জিনিস তাঁর হাতের নাগাল থেকে সরিয়ে ফেলতুম। আমার ঘরে ঢুকলে আমি তৎক্ষণাৎ তাকে একথালা আস্ত আখরোট খেতে দিতুম।

দুটো একটা খেতেন মাঝে মাঝে—যাওয়ার পর দেখা যেত সব ক'টি আখরোটের খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছেন, চহারমগজশিকন (হাতুড়ি) না দেওয়া সত্ত্বেও।

এ রকম অজাতশত্রু লোক সমস্ত কাবুল শহরে আমি দুটি দেখিনি। একদিন তাই যখন দেমিদফের ঘরে আলোচনা হচ্ছিল তখন বলশফের সবচেয়ে দিলীদোস্ত রোগাপটকা শ্নিয়েশকফ বললেন, 'বলশফের সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব তার গায়ের জোরের ভয়ে।'

বলশফ বললেন, 'তা হলে তো তোমার সবচেয়ে বেশী শত্রু থাকার কথা।'

শ্নিয়েশকফ যা বললেন, পদাবলীর ভাষায় প্রকাশ করলে তার রূপ হয়—

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তুঁহারি রূপে—'

বাকীটা তিনি আর প্রাণের ভয়ে বলেননি।

www.MurchOna.com

বলশফ বললেন; 'রোগা লোকের ঐ এক মস্ত দোষ। খামকা বাজে তর্ক করে। বলে কিনা 'ভয়ে বন্ধুত্ব!' যতসব পরস্পরদ্রোহী, আত্মঘাতী বাক্যাড়ম্বর!'

বলশফ সম্বন্ধে এত কথা বললুম তার কারণ তিনি তখন আমান-উল্লার অ্যারফোর্সের ডাঙর পাইলট। বলশেভিক-বিদ্রোহ জুড়িয়ে গিয়ে থিতিয়ে যাওয়ায় তাঁর সংকটাকাঙ্ক্ষী মন কাবুলে এসে নূতন বিপদের সন্ধানে আমানউল্লার চাকরী নিয়েছিল।

শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমানউল্লার সেবা করেছিলেন।

বত্রিশ

আমানউল্লা ইয়োরোপ থেকে নিয়ে এলেন একগাদা দামী আসবাবপত্র অগুণতি মোটর গাড়ি আর বক্তৃতা দেবার বদ অভ্যাস। প্রাচ্যদেশের লোক খেয়েদেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে আরামে গা এলিয়ে দেয়, পশ্চিমে ডিনারের পর স্পীচ, লাঞ্চের পর অরেটরি—তাও আবার যত সব শিরঃ-পীড়াদায়ক পোলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে।

সায়েবরা বিলেতে লাঞ্চে ডিনারে আমানউল্লাকে যে নেশার পয়লা পাত্র খাইয়ে দিয়েছিল তার খোয়ারি তিনি চালালেন কাবুলে ফিরে এসে, মাত্রা বাড়িয়ে, লম্বা লম্বা লেকচার ঝেড়ে। পর পর তিনদিনে নাকি তিনি একুনে ত্রিশ ঘন্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

কিন্তু কারো কথায় তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না, কাবুলে চিঁড়ের প্রচলন নেই—কাজেই শ্রোতারা কেউ ঘুমলো, কেউ শুনলো, দু'-একজন মনে মনে ইয়োরোপে তাঁর সাজে খর্চার আঁক কষলো।

তারপর আরম্ভ হল সংস্কারের পালা। একদিন সকালবেলা মৌলানার বাড়ি যেতে গিয়ে দেখি পনরো আনা দোকানপাট বন্ধ। বড় দোকানের ভিতর গ্রামোফোন ফোটোগ্রাফের দোকানটা খোলা ছিল। দোকানদার পাঞ্জাবী, অমৃতসরের লোক; আমাদের সঙ্গে ভাব ছিল।

খবর শুনে বিশ্বাস হল না। আমানউল্লার হুকুম 'কার্পেটের উপর পদ্মাসনে বসে দোকান চালাবার কায়দা বেআইনী করা হল; সব দোকানে বিলিতী কায়দায় চেয়ার টেবিল চাই।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা? ছুতোর কামার, কালাইগর, মুচী?'

'সব, সব।'

www.MurchOna.com

'ছোট ছোট খোপের ভিতর চেয়ার টেবিল ঢোকাবে কি করে, পাবেই বা কোথায় ?'

নিরুত্তর।

'যারা পয়সাওয়ালা, যাদের দোকানে জায়গা আছে ?'

'রাতারাতি মেজ-কুর্সি পাবে কোথায় ? ছুতোরও ভয়ে দোকান বন্ধ করেছে। বলে, চেয়ারে বসে টেবিলে তক্তা রেখে সে নাকি রাঁদা চালাতে শেখেনি।'

'আগের থেকে নোটিশ দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়নি ?'

'না। জানেন তো, আমানউল্লা বাদশার সব কুছ ঝটপট্।'

পাক্কা তিন সপ্তাহ চোদ্দ আনা দোকানপাট বন্ধ রইল। গম ডাল অবিশ্যি পিছনের দরজা দিয়ে আড়ালে আবডালে বিক্রি হল, তাদের উপরে চোটপাট করে পুলিশ দু'পয়সা কামিয়ে নিল।

আমানউল্লা হার মানলেন কিনা জানিনে তবে তিন সপ্তাহ পরে একে একে সব দোকানই খুলল—পূর্ববৎ, অর্থাৎ বিন্ চেয়ার-টেবিল। কাবুলের সবাই এই ব্যাপারে চটে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু রাজার খামখেয়ালীতে তারা অভ্যস্ত বলে অত্যধিক উষ্মাবোধ করেনি। কাবুলীদের এ মনোভাবটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি, কারণ আমরা ভারতবর্ষে অত্যাচার-অবিচারে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু খামখেয়ালী বড় একটা দেখতে পাইনে।

আমার মনে খটকা লাগল। পাগমানের পাগলামির কথা মনে পড়ল—গাঁয়ের লোককে শহরে ডেকে এনে মর্নিংসুট পরাবার বিড়ম্বনা। এ যে তারি পুনরাবৃত্তি; এ যে আরো পীড়াদায়ক, মূল্যহীন, অর্থহীন, ইয়োরোপের অন্ধানুকরণ।

মীর আসলমের সঙ্গে দেখা হলে পর তিনি আমাকে সবিস্তর আলোচনা না করতে দিয়ে যেটুকু বললেন বাঙলা ছন্দে তার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

কয়লাওয়ালার দোস্তী ? তওবা !
ময়লা হতে রেহাই নাই
আতরওয়ালার বাক্স বন্ধ
দিলখুশ তবু পাই খুশবাই।

আমি বললুম, 'এ তো হল সূত্র, ব্যাখ্যা করুন।'

মীর আসলম বললেন, 'পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের সঙ্গে গাত্র ঘর্ষণ করতঃ আমানউল্লা যে কৃষ্ণপ্রস্তর চূর্ণ সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া আসিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি কাবুলহট্ট মসীলিপ্ত করিবার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন।

www.MurchOna.com

'তথাপি অস্মদ্দেশীয় বিদগ্ধজনের শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত যদি নৃপতি প্রস্তরচূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রস্তরখন্ড আনয়ন করিতেন। তদ্দ্বারা ইন্ধন প্রজ্বলিত করিলে দীন দেশের শৈত্য নিবারিত হইত।'

আমি বললুম, 'চেয়ার টেবিল চালানো যদি মসীলেপন মাত্রই হয় তবে তা নিয়ে এমন ভয়ংকর দুঃখ করবার কি আছে বলুন।'

মীর আসলম বললেন, 'অযথা শক্তিক্ষয়। নৃপতির অবমাননা। ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

কিন্তু আর পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখলুম যে, তাঁরা মীর আসলমের মত কালো চশমা পরে ভবিষ্যৎ এত কালো করে দেখছেন না। ছোকরাদের চোখে তো গোলাপী চশমা; গোলাপী বললেও ভুল বলা হয়,—সে চশমা লাল টকটকে, রক্ত-মাখানো। তারা বলে, যে সব বদমায়েশরা এখনো কার্পেটে বসে দোকান চালাচ্ছে তাদের ধরে ধরে কামানের মুখে বেঁধে হাজারো টুকরো করে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমানউল্লা নিতান্ত ঠান্ডা বাদশা বলেই তাদের রেহাই দিয়েছেন।'

ভেবে চিন্তে আমি গোলাপী চশমাই পরলুম।

তার কিছুদিন পরে আরেক নয়া সংস্কারের খবর আনলেন মৌলানা। আফগান সেপাইদের মানা করা হয়েছে, তারা যেন কোনো মোল্লাকে মুরশিদ না বানায় অর্থাৎ গুরু স্বীকার করে যেন মন্ত্র না নেয়।

খাঁটি ইসলামে গুরু ধরার রেওয়াজ নেই। পন্ডিতেরা বলেন, 'কুরান শরীফ কিতাবুম্মুবীন' অর্থাৎ 'খোলা কিতাব'; তাতেই জীবনযাত্রার প্রণালী আর পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের পন্থা সোজা ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে; গুরু মেনে নিয়ে তার অন্ধানুসরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

অন্য দল বলেন, 'একথা আরবদের জন্য খাটতে পারে, কারণ তারা আরবীতে কুরান পড়তে পারে। কিন্তু ইরানী কাবুলীরা আরবী জানে না; গুরু না নিলে কি উপায় ?'

এ-তর্কের শেষ কখনো হবে না।

কিন্তু বিষয়টা যদি ধর্মের গন্ডির ভিতরেই বন্ধ থাকত, তবে আমান-উল্লা গুরু ধরা বারণ করতেন না। কারণ, যদিও মানুষ গুরু স্বীকার করে ধর্মের জন্য, তবু দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত গুরু দুনিয়াদারীর সব ব্যাপারেও উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছেন এবং গুরুর উপদেশ সাক্ষাৎ আদেশ।

তাহলে দাঁড়ালো এই যে, আমানউল্লার আদেশের বিরুদ্ধে মোল্লা যদি তাঁর শিষ্য কোনো সেপাইকে পাল্টা আদেশ দেন, তবে সে সেপাই মোল্লার আদেশই যে মেনে নেবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

www.MurchOna.com

চার্চ বনাম স্টেট।

গোলাপী চশমাটা কপালে তুলে অনুসন্ধান করলুম, দেয়ালে কোনো লেখা ফুটে উঠেছে কিনা, আমানউল্লা কেন হঠাৎ এ আদেশ জারী করলেন। তবে কি কোনো অবাধ্যতা, কোনো বিদ্রোহ, কোনো—? কিন্তু এসব সন্দেহ কাবুলে মুখ ফুটে বলা তো দূরের কথা, ভাবতে পর্যন্ত ভয় হয়।

আমার শেষ ভরসা মীর আসলম। তিনি দেখি কালো চশমার আরেক পোঁচ ভুসো মাখিয়ে রাজনৈতিক আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। খবরটা দেখলুম তিনি বহু পূর্বেই জেনে গিয়েছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'ইহলোক পরলোক সর্বলোকের জন্যই গুরু নিষ্প্রয়োজন। তৎসত্ত্বেও যদি কেহ অনুসন্ধান করে, তবে তাহাকে প্রতিরোধ করাও ততোধিক নিষ্প্রয়োজন।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনি যখন আপনার ভারতীয় গুরুর কথা স্মরণ করেন, তখনই তো দেখেছি তাঁর প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ।'

মীর আসলম বললেন, 'গুরু দ্বিবিধ; যে গুরুগৃহে প্রবেশ করার দিন তোমার মনে হইবে, গুরু ভিন্ন পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না এবং ত্যাগ করার দিন মনে হইবে, গুরুতে তোমার প্রয়োজন নাই, তিনিই যথার্থ গুরু—গুরুর আদর্শ তিনি যেন একদিন শিষ্যের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরু শিষ্যকে প্রতিদিন পরাধীন হইতে পরাধীনতর করেন। অবশেষে গুরু বিনা সে-শিষ্য নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস কর্ম পর্যন্ত সুসম্পন্ন করিতে পারে না। আমার গুরু প্রথম শ্রেণীর। আফগান সৈন্যের গুরু দ্বিতীয় শ্রেণীর।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ আপনার গুরু আপনাকে স্বাধীন করলেন; আফগান সেপাইয়ের গুরু তাকে পরাধীন করেন। পরাধীনতা ভালো জিনিস নয়, তবে কেন বলেন, গুরু নিষ্প্রয়োজন? বরঞ্চ বলুন, গুরু-গ্রহণ সেখানে অপকর্ম।'

মীর আসলম বললেন, 'ভদ্র, সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রশ্ন, সংসারে কয়জন লোক স্বাধীন হইয়া চলিতে ভালোবাসে বা চলিতে পারে। যাহারা পারে না, তাহাদের জন্য অন্য কি উপায়?'

আমি বললুম, 'খুদায় মালুম। কিন্তু উপস্থিত বলুন, সৈন্যদের বিদ্রোহ করার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা?'

মীর আসলম বললেন, 'নৃপতির সন্নিকটস্থ সেনাবাহিনী কখনো বিদ্রোহ করে না, যতক্ষণ না সিংহাসনের জন্য অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হন।'

আমি ভারি খুশী হয়ে বিদায় নিতে গিয়ে বললুম, 'কয়েকদিন হল লক্ষ্য করছি, আপনার ভাষা থেকে আপনি কঠিন আরবী শব্দ কমিয়ে আনছেন। সেটা কি সজ্ঞানে?'

www.MurchOna.com

মীর আসলম পরম পরিতোষ সহকারে মাথা দোলাতে দোলাতে হঠাৎ অত্যন্ত গ্রাম্য কাবুলী ফার্সীতে বললেন, 'এ্যাদ্দিনে বুঝতে পারলে চাঁদ ? তবে হক কথা শুনে নাও। আর বছর যখন হেথায় এলে তখন ফার্সী জানতে চু-চু। তাইতে তোমায় তালিম দেবার জন্য আরবী শব্দের বেড়া বানাতুম, তুমি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পেরোতে; গোড়ার দিকে ঠ্যাঙগুলো জখম-টখমও হয়েছে। এখন দিব্যি আরবী ঘোড়ার মত আরবী বেড়া ডিঙোচ্ছো বলে খামকা বখেড়া বাঁধার কম্ম বন্ধ করে দিলুম। গুরু এখন ফালতো। মাথার ভসভসে ঘিলুতে তুরপুন সিঁধোলো ?'

আমি বাড়ি ফেরার সময় ভাবলুম, 'লোকটি সত্যিকার পন্ডিত। গুরু কি করে নিজেকে নিষ্প্রয়োজন করে তোলেন, সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন।'

তারপর বেশী দিন যায়নি, এমনি সময় একদিন নোটিশ পেলুম, একদল আফগান মেয়েকে উচ্চশিক্ষার জন্য তুর্কীতে পাঠানো হবে; স্বয়ং বাদশা উপস্থিত থেকে তাদের বিদায়-আশীর্বাদ দেবেন।

আমি যাইনি। বৃটিশ রাজদূতাবাসের এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীর মুখ থেকে বর্ণনাটা শুনলুম। তার নাম বলব না, সে নাম এখনো মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের খবরের কাগজে ধূমকেতুর মত দেখা দেয়। বললেন, 'গিয়ে দেখি, জনকুড়ি কাবুলী মেয়ে গার্ল গাইডের ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে। আমানউল্লা স্বয়ং উপস্থিত, অনেক সরকারী কর্মচারী, বিদেশী রাজদূতাবাসের গণ্যমান্য সভ্যগণ, আর একপাশে মহিলারা। রানী সুরাইয়াও আছেন, হ্যাটের সামনে পাতলা নেটের পরদা।

'আমানউল্লা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক খাঁটি এবং পুরানো কথা দিয়ে অবতরণিকা শেষ করে বললেন, 'আমি পর্দা প্রথার পক্ষপাতী নই, তাই আমি এই মেয়েদের বিনা বোরকায় তুর্কী পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমি স্বাধীনতাপ্রয়াসী; তাই কাবুলের কোনো মেয়ে যদি মুখের সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে রাস্তায় বেরতে চায়, তবে আমি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আবার আমি কাউকে জোর করতেও চাইনে, এমন কি, মহিষী সুরাইয়াও যদি বোরকা পরাই পছন্দ করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

কর্মচারীটি বললেন, 'এতটা ভালোয়-ভালোয় চলল। কিন্তু আমান-উল্লার বক্তৃতা শেষ হতেই রানী সুরাইয়া এগিয়ে এসে নাটকী ঢঙে হ্যাটের সামনের পর্দা ছিঁড়ে ফেললেন। কাবুল শহরের লোক সভাস্থলে আফগানিস্থানের রাজমহিষীর মুখ দেখতে পেল।'

কর্মচারীটির রসবোধ অত্যন্ত কম, তাই বর্ণনাটা দিলেন নিতান্ত নীরস-নির্জলা। কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করব, তারও উপায়

www.MurchOna.com

নেই। হয়ত ঘুঘু এসেছেন রিপোর্ট তৈরী করবার মতলব নিয়ে—ঘটনাটা ভারতবাসীর মনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই হবে রিপোর্টের মশলা। আমিও 'পোকার' খেলার জুয়াড়ীর মত মুখ করে বসে রইলুম।

যাবার সময় বললেন, 'এরকমধারা ড্রামাটিক কায়দায় পর্দা ছেঁড়ার কি প্রয়োজন ছিল ? রয়েসয়ে করলেই ভালো হত না ?'

আমি মনে মনে বললুম, 'ইংরেজের সনাতন পন্থা। সব কিছু রয়েসয়ে। সব কিছু টাপেটোপে। তা সে ইংরিজী লেখাপড়া চালানোই হোক, আর ঢাকাই মসলিনের বুক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করাই হোক। ছুঁচ হয়ে ঢুকবে, মুষল হয়ে বেরবে।'

কিছু একটা বলতে হয়। নিবেদন করলুম, 'এসব বিষয়ে এককালে ভারতবাসী মাত্রই কোনো না কোনো মত পোষণ করত। কারণ তখনকার দিনে আফগানিস্থান ভারতবর্ষের মুখের দিকে না তাকিয়ে কোনো কাজ করত না, কিন্তু এখন আমানউল্লা নিজের চোখে সমস্ত পশ্চিম দেখে এসেছেন, রাস্তা তাঁর চেনা হয়ে গিয়েছে; আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব, মঙ্গল কামনা করব, ব্যস।'

কর্মচারী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে ভাবলুম।

কিন্তু একটা কথা এখানে আমি আমার পাঠকদের বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি এবং কাবুলের আর পাঁচজন তখন আমান-উল্লার এসব সংস্কার নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাইনি। মানুষের সদ্ভাব আপন ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে বড় করে দেখা—হাতের সামনের আপন মুঠি হিমালয় পাহাড়কে ঢেকে রাখে। দ্বিতীয়ত যে-সব সংস্কার করা হচ্ছিল তার একটাও আমার মত পাঁচজনের সদ্বার্থকে স্পর্শ করেনি। সুট সঙ্গে নিয়েই আমরা কাবুল গিয়েছি, কাজেই সুট পরার আইন আমাদের বিচলিত করবে কেন; আর আমরা পাতলা নেটের ব্যবসাও করিনে যে, মহারানী তাঁর হ্যাটের নেট ছিঁড়ে ফেললে আমাদের দেউলে হতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ইরান-আফগানিস্থানের বাদশা দেশের লোকের মাল-জানের মালিক। আর সকলেই জানে এই দুই বস্তুই অত্যন্ত ফানী—নশ্বর। নশ্বর জিনিস এমনি যাবে অমনিও যাবে—বাদশাহের খাম-খেয়ালি নিমিত্তের ভাগী মাত্র। রাজা বাদশা তো আর গাধাখচ্চর নন যে, শুধু দেশের মোট পিঠে করে বইবেন আর জাবর কাটবেন—তাঁরা হলেন গিয়ে তাজী ঘোড়ার জাত। দেশটাকে পিঠে নিয়ে যেমন হঠাৎ প্রগতির দিকে খামকা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবেন, তেমনি কারণে অকারণে সোয়ারকে দুটো চারটে লাথিচাটও মারবেন। তাই বলে তো আর ঘোড়ার দানাপানি বন্ধ করে দেওয়া যায় না।

www.MurchOna.com

কাজেই কাবুল শহরের লোকজন খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমচ্ছে, বেরিয়ে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় আমানউল্লার প্রতিজ্ঞা যে তিনি সব মেয়েদের বেপর্দায় বেরবার সাহায্য করবেন এক ভিন্নরূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। শোনা গেল বাদশার হুকুম, কোনো স্ত্রীলোক যদি বেপর্দা বেরতে চায় তবে তার স্বামী যেন কোনো ওজর-আপত্তি না করে। যাদের আপত্তি আছে, তারা যেন বউদের তালাক দিয়ে দেয়। আর তারা যদি সরকারী চাকরী করে, তবে আমানউল্লা দেখে নেবেন। কি দেখে নেবেন ? সেটা পষ্টাপষ্টি বলা হয়নি, তবে চাকরীটাও হয়ত বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সাধে কি আর বাঙলায় বলি, 'বিবিজান চলে যান লবে-জান করে।' শুধু বিবিজান চলে গেলে সুস্থ মানুষ—প্রেমিকদের কথা আলাদা—'লবে-জান' হবে কেন ? সঙ্গে সঙ্গে চাকরীটা গেলে পর মানুষ অনাহারে 'লবে-জান' হয়।

মীর আসলম বললেন, 'গিন্নীকে গিয়ে বল, 'ওগো চোখে সুরমা লাগিয়ে বে-বোরকায় কাবুল শহরে এট্টা রোদ মেরে এস।' বিশ্বাস করবে না ভায়া, বদনা ছুঁড়ে মারলে। তা জানো তো, মোল্লার পাগড়ি, বদনাটাই খেল টোল। আম্মো অবিশ্যি টাল খেয়ে খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।'

আমি বললুম, 'হাঁ হাঁ জানি, পাগড়ি অনেক কাজে লাগে।'

মীর আসলম বললেন, 'ছাই জানো, বে করলে জানতে। বেয়াড়া বউকে তোমার তো আর বেঁধে রাখতে হয় না।'

আমি বললুম, 'বাজে কথা। বাঁধন আমানউল্লা ক্যাচ করে কেটে দিয়েছেন। আর ভালোই করেছেন, বউকে বেঁধে রাখতে হয় মনের শিকল দিয়ে, হৃদয়ের জিঞ্জির দিয়ে।'

মীর আসলম বললেন, 'হৃদয়মনের কথা ওঠে যেখানে তরুণ-তরুণীর ব্যাপার। ষাট বছরের বুড়ো ষোল বছরের বউকে কোন্ মনের শেকল দিয়ে বাঁধতে পারে বলো ? সেখানে কাবিন-নামা, সর্বাঙ্গ ঢাকা বোরকা, আর পাগড়ির ন্যাজ।'

আমি বললুম, 'তাতো বটেই।'

মীর আসলম বললেন, 'আমানউল্লা যে পর্দা ছেঁড়ার জন্য তম্বী লাগিয়েছেন, তাতে জোয়ানদের কি ? বেদনাটা সেখানে নয়। বুড়া সর্দারদের ভিতর চিংড়ি বউদের ঠেকাবার জন্য সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'তরুণীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন নাকি ?'

তিনি বললেন, 'ভ্যালা রে বিপদ, আমাকে তুমি নওরোজের আকবর বাদশা ঠাওরালে নাকি ? চিংড়িদের আমি চিনব কোত্থেকে ? ইস্তক মেয়ে

www.MurchOna.com

নেই, ছেলের বউও নেই। গিন্নীর বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু বয়স ভাঁড়িয়ে হাফ-টিকিট কেটেছেন, দেখলে বোঝা যায় শ' খানেক হবে।'

আমি বললুম, 'তবে কি বুড়োরা খামকা ভয় পেয়েছেন ?'

মীর আসলম বললেন, 'শোনো। খুলে বলি। আমানউল্লার হুকুম শোনা মাত্র চিংড়িরা যদি লাফ দিয়ে উঠত, তবে বুড়োরাও না হয় তার একটা দাওয়াই বের করত; এই মনে করো তুমি যদি হঠাৎ তলোয়ার নিয়ে কাউকে হামলা করো, সেও কিছু একটা করবে। বীর হলে লড়বে, বকরীর কলিজা হলে ন্যাজ দেখাবে। কিন্তু এ তো বাপু, তা নয়, এ হল মাথার ওপর ঝোলানো নাঙা তলোয়ার। চিংড়িরা হয়ত সব চুপ করে বসে আছে—রাস্তায় তো এখনো চাঁদের হাট বসেনি—কিন্তু এক একজন এক এক শ' খানা তলোয়ার হয়ে চাঁদির ওপর ঝুলে আছেন। চোখ দুটি বন্ধ করে একটিবার দেখে নাও, বাপু।'

শিউরে উঠলুম।

তেত্রিশ

একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ মূর্তি। চেনা চেনা মনে হল অথচ যেন অচেনা। তার হাতের ট্রের দিকে নজর যেতে দেখি সেটা সম্পূর্ণ চেনা। তার উপরকার রুটি, মাখন, মামলেট, বাসি কাবাবও নিত্যিকার চেহারা নিয়ে উপস্থিত। ধুম দেখলে বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়; সকালবেলা আমার ঘরে এ রকমের ট্রে হাওয়ায় দুলতে পারে না, বাহক আবদুর রহমানের উপস্থিতি স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু কী বেশভূষা! পাজামা পরেনি, পরেছে পাতলুন। কয়েদীদের পাতলুনের মত সেটা নেমে এসেছে হাঁটুর ইঞ্চি তিনেক নিচে; উরুতে আবার সে পাতলুন এমনি টাইট যে, মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাইট সাটিনের ব্রিচেস্ পরেছেন। শার্ট, কিন্তু কলার নেই। খোলা গলার উপর একটা টাই বাঁধা। গলা বন্ধ কোট, কিন্তু এত ছোট সাইজের যে, বোতাম লাগানোর প্রশ্নই ওঠে না—তাই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শার্ট আর টাই। দু'কান ছোঁয়া হ্যাট, ভুরু পর্যন্ত গিলে ফেলেছে। দোকানে যে রকম হ্যাট-স্ট্যান্ডের উপর খাড়া করানো থাকে!

পায়ে নাগরাই, চোখে হাসি, মুখে খুশী।

আবদুর রহমানের সঙ্গে এক বছর ঘর করেছি। চটে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে হস্তীর সঙ্গে নানাদিক দিয়ে তুলনা করেছি, কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ

www.MurchOna.com

সুস্থ, তার মাথায় যে ছিট নেই সে বিষয়ে আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। তাই চোখ বন্ধ করে বললুম, 'বুঝিয়ে বল।'

আমার যে খটকা লাগবে সে বিষয়ে সে সচেতন ছিল বলে বলল, 'দেরেশি পুশিদম'—অর্থাৎ 'সুট পরেছি।'

আমি শুধালুম, 'সরকারী চাকরী পেলে লোকে দেরেশি পরে; আমার চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ নাকি ?'

আবদুর রহমান বলল, 'তওবা, তওবা, আপনি সায়েব আমার সরকার, আমার রুটি দেনেওয়ালা ?'

'তবে ?'

'সকালবেলা রুটি কিনতে গেলে পর পুলিশ ধরলো। বলল, 'বাদশার হুকুম আজ থেকে কাবুলের রাস্তায় পাজামা, কুর্তা, জোব্বা পরে বেরোনো বারণ—সবাইকে দেরেশি পরতে হবে।' আমার কাছ থেকে এক পাই জরিমানাও আদায় করল। রুটি কিনে ফেরবার পথে আর দু'তিনটে পুলিশ ধরল। আপনার দোহাই পেড়ে কোনো গতিকে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ির সামনে আমাদের পড়শী কর্নেল সায়েবের সঙ্গে দেখা, তিনি ডেকে নিয়ে এই দেরেশি দিলেন, আমাকে তিনি বড্ড স্নেহ করেন কিনা, আমিও তাঁর ফাইফরমাশ করে দিই।'

গুম্ হয়ে শুনলাম। শেষটায় বললুম, 'দর্জির দোকানে তো এখন ভিড় হওয়ার কথা। দু'দিন বাদে গিয়ে তোমার পছন্দমত একটা দেরেশি করিয়ে নিয়ো।'

আবদুর রহমান হিসেবী লোক; বলল, 'এই তো বেশ।'

আমি বললুম, 'চুপ। আর দুপুরবেলা এক জোড়া বুট কিনে নিয়ো।'

আবদুর রহমান কলরব করে বলল, 'না হুজুর তার দরকার নেই। পুলিশের ফিরিস্তিতে বুটের নাম নেই।'

প্রথমটায় অবাক হলুম। পরে বুঝলুম ঠিকই তো; লক্ষ্মণ না হয় সীতাদেবীর পায়ের দিকে তাকাতে পারেন—রাজাপ্রজায় তো সে সম্পর্ক নয় !

বললুম, 'চুপ। দুপুরবেলা কিনবে। আর দেখো, এবার হ্যাটটা খুলে ফেলো।'

আবদুর রহমান চুপ।

বললুম, 'খুলে ফেলো।'

আবদুর রহমান আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হুজুরের সামনে ?' তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ল উত্তর আফগানিস্থান তুর্কিস্থানের মানুষ শয়তানের

www.MurchOna.com

ভয় পেলে পাগড়ি খুলে ফেলে। শুধু-মাথা দেখলে নাকি শয়তান পালায়। তাই আবদুর রহমান ফাঁপরে পড়েছে। তখন মনে পড়ল যে, হৌস অব কমন্সে হ্যাট না পরা থাকলে কথা কইতে দেয় না। বললুম, 'থাক তাহলে তোমার মাথার হ্যাট।'

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি শহর অন্যদিনের তুলনায় ফাঁকা। দেরেশির অভাবে লোকজন বাড়ি থেকে বেরতে পারেনি। পর্দা তুলে দেওয়াতে যেমন রাস্তাঘাটে মেয়েদের ভিড় বাড়ার কথা ছিল তেমনি দেরেশির রেওয়াজ এক নূতন ধরনের পর্দা হয়ে পুরুষদের হারেমবন্ধ করল।

যারা বেরিয়েছে তাদের দেরেশির বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। যত রকম ছেঁড়া, নোংরা, শরীরের তুলনায় হয় ছোট নয় বড়, কোট-পাতলুন, প্লাস-ফোর্স, ব্রিচেস্ দিয়ে যত রকমের সম্ভব অসম্ভব খিচুড়ি পাকানো যেতে পারে তাই পরে কাবুল শহর রাস্তায় বেরিয়েছে—গোটা দশেক পাগলা-গারদকে হলিউডের গ্রীনরুমে ছেড়ে দিলেও এর চেয়ে বিপর্যয় কান্ড সম্ভবপর হত না।

ইয়োরোপীয়রা বেরিয়েছে তামাশা দেখতে। আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আফগানিস্থানকে আমি কখনো পর ভাবিনি।

শহরতলী দিয়ে আমাকে কাজে যেতে হয়। সেখানে দেখি আরো কঠোর দৃশ্য। গ্রামের লাকড়ীওয়ালা, সব্জীওয়ালা, আন্ডাওয়ালা যেই শহরের চৌহদ্দির ভিতরে পা দেয় অমনি পুলিশ তাদের ধরে ধরে এক এক পাই করে জরিমানা করে। বেচারীদের কোনো রসিদ দেওয়া হয় না; কাজেই দশ পা যেতে না যেতে তাদের কাছ থেকে অন্য পুলিশ এসে আবার নূতন করে জরিমানা আদায় করে। দুনিয়ার যত পুলিশ সেদিন কাবুলের শহরতলীতে জড়ো হয়েছে। খবর নিয়ে শুনলাম যারা এ সময়ে অফ্-ডিউটি তারাও উর্দি পরে পয়সা রোজকার করতে লেগে গিয়েছে—জরিমানার পয়সা নাকি সরকারী তহবিলে জমা দেওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করা হয়নি।

দিবাদ্বিপ্রহরে যে কাবুলী পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমনোতে রেকর্ড ব্রেক করতে পারে, তার ব্যস্ততা দেখে মনে হল, যেন তার বাস্তু-বাড়িতে আগুন লেগেছে।

এ অত্যাচার ক'দিন ধরে চলেছিল বলতে পারিনে।

দুই সপ্তাহ ধরে দেশের খবরের কাগজ চিঠিপত্র পাইনি। খবর নিয়ে শুনলুম জলালাবাদ-কাবুলের রাস্তা বরফে ঢাকা পড়ায় মেল-বাস্ আসতে পারেনি; দু'-একজন ফিস্ফিস্ করে বলল, রাস্তায় নাকি লুটতরাজও

www.MurchOna.com

হচ্ছে। মীর আসলম সাবধান করে গেলেন যেন যেখানে সেখানে যা তা প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করি।

অন্য কাজ শেষ হলে মেয়েদের ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস ও সেকেন্ড মিস্ট্রেসকে আমি ইংরিজী পড়াতুম। আফগান মেয়েরা চালাক; জানে যে ধনীর কাছ থেকে টাকা বের করা শক্ত, কিন্তু গরীবের দরাজ-হাত। জ্ঞানের বেলাতেও এই নীতি খাটবে ভেবে এই দুই মহিলা আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

হেড মিস্ট্রেসের বয়স পঞ্চাশের উপর; মাতৃভাষা বাদ দিলে জীবনে তিনি এই প্রথম ভাষা শিখছেন। কাজেই কাবুলের পাথর-ফাটা শীতেও তাকে আমি ইংরিজী বানান শেখাতে গিয়ে ঘেমে উঠতুম। ইংরিজী ভাষা শিখতে বসেছেন, কিন্তু ঐ এক বিষয় ছাড়া দুনিয়ার আর সব জিনিসে তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। বিশেষ করে মাস্টার মশায়ের বয়স কত, দেশ কোথায়, দেশের জন্য মন খারাপ হয় কিনা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই তাঁর বাধতো না। তবে খুব সম্ভব আমার এপেনডিক্সের সাইজ ও এ-জগতে আমার জন্মাবার কি প্রয়োজন ছিল, এ দুটো প্রশ্ন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেননি। আমার উত্তর দেবার কায়দাও ছিল বিচিত্র। আমার দেশ? আমার দেশ হল Bengal, বানানটা শিখে নিন, বি ই এন জি এ এল। উচ্চারণটাও শিখে নিন; কেউ বলে বেনগোল, আবার কেউ বলে বেঙোল। ঠিক তেমনি France—এফ আর—।' তিনি বলতেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তা বলুন তো, বাঙালী মেয়েরা দেখতে কি রকম? শুনেছি তাদের খুব বড় চুল হয়, 'কুন্তলবৃষ্য' বলে এক-রকম তেল এদেশে পাওয়া যায়। আপনি কী তেল মাখেন? আমাদের দু'জনার এই চাপান-উতোরের মাঝখানে পড়ে ইংরিজী ভাষা বেশী এগতে পারতো না, বিশেষ করে তিনি যখন আমাকে আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেন। মায়ের কথা বলার ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে শব্দ কে শেখাবার এলেম আমার পেটে নেই।

সেকেন্ড মিস্ট্রেসের বয়স কম—ত্রিশ হয় না হয়। দুটি বাচ্চার মা, থলথলে দেহ, খাঁদা নাক, মুখে এক গাদা হাসি, পরনে বারো মাস প্লিপওভার, লম্বা-হাতা ব্লাউজ আর নেভি ব্লু ফ্রক। কর্নেলের বউ, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে আর আমি যখন কর্ত্রীর প্রশ্নের চাপে নাজেহাল হতুম, তখন তিনি মিটমিটিয়ে হাসতেন আর নিতান্ত বেয়াড়া প্রশ্নে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলে মাঝে মাঝে উদ্ধার করে দিতেন।

জোর শীত কিন্তু তখনো বরফ পড়েনি এমন সময় একদিন পড়াতে

www.MurchOna.com

গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি কর্নেলের বউ বইয়ের উপর মুখ গুঁজে টেবিলে ঝুঁকে পড়েছেন আর কর্ত্রী তার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে কর্নেলের বউ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। দেখি আর দিনের মত মুখের হাসির সদাগতসম্ভাষণ নেই। চোখ দুটো লাল, নাকের ডগার চামড়া যেন ছড়ে গিয়েছে।

এসব জিনিস লক্ষ্য করতে নেই। আমি বই খুলে পড়াতে আরম্ভ করলুম। দুমিনিটও যায়নি, হঠাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাঝখানে কর্নেলের বউ দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলুম। কর্ত্রী শান্তভাবে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে থাকলেন, 'অধীর হয়ো না, অধীর হয়ো না। খুদাতালা মেহেরবান। বিশ্বাস হারিয়ো না, শান্ত হও।'

আমি চোখের ঠারে কর্ত্রীকে শুধালুম, 'আমি তাহলে উঠি ?'

তিনি ঘাড় নেড়ে যেতে বারণ করলেন। দু'মিনিট যেতে না যেতে আবার কান্না, আবার সান্ত্বনা; আমি যে সে অবস্থায় কি করব ভেবেই পাচ্ছিলুম না। কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে যা বলছিলেন তাঁর থেকে গোড়ার দিকে মাত্র এইটুকু বুঝলুম যে, তিনি তাঁর সোয়ামীর অমঙ্গল চিন্তা করে দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ভালো করে কিছু বলতে গেলেই কর্ত্রী বাধা দিয়ে তাঁকে ওসব কথা তুলতে বারণ করছিলেন। বুঝলুম যে, সেগুলো প্রকাশ্যে বলা বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু তিনি তখন এমনি আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে বসেছেন যে, তাঁকে ঠেকানো মুশকিল। কখনও বলেন, 'শিনওয়ারীরা বর্বর জানোয়ার' কখনো বলেন, 'সাতদিন ধরে সরকারী কোনো খবর পাওয়া যায়নি' কখনো বলেন, 'শিনওয়ারীরা শহরে পৌঁছিলে কোনো অফিসার পরিবারের রক্ষা নেই।'

জলালাবাদ অঞ্চলে লুটতরাজ হচ্ছে আগেই গুজব হিসেবে শুনেছিলুম; তার সঙ্গে এসব ছেঁড়াছেঁড়া খবর জুড়ে দিয়ে বুঝতে পারলুম যে, সে অঞ্চলে শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করে কাবুলের দিকে রওয়ানা হয়েছে, আমানউল্লা তাদের ঠেকাবার জন্য যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন সাতদিন ধরে তাদের সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাস্য খবর পাওয়া যায়নি, আর কাবুলের অফিসার-মহলে গুজব, সে বাহিনীর অফিসাররা শিনওয়ারীদের হাতে ধরা পড়েছেন।

এত বড় দুঃসংবাদ ইংরিজী পড়ার চেষ্টা দিয়ে দমন করা অসম্ভব। আর আমি এসব সংবাদ জেনে ফেলেছি সেটাও কর্ত্রী আদপেই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু কর্নেলের বউকে তিনি কিছুতেই ঠেকাতেও

www.MurchOna.com

পারছিলেন না। শেষটায় আমি এক রকম জোর করে ওঠবার চেষ্টা করলে কর্নেলের বউ হঠাৎ চোখ মুছে বললেন, 'না, মুআল্লিম সাহেব, আপনি যাবেন না, আমি পড়াতে মন দিচ্ছি।'

এ রকম পড়া আমাকে যেন জীবনে আর না পড়াতে হয়। এবার যখন ভেঙে পড়লেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, 'বাদশা আমানউল্লার মত যারা গোঁফ রেখেছে তাদের ধরে ধরে উপরের ঠোঁট কেটে ফেলছে।' আমানউল্লা ঠিক নাকের তলায় একটুখানি গোঁফ রাখেন—সেই টুথ ব্রাশ মুস্তাশ ফ্যাশান ফৌজী অফিসারদের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল।

এবারে আমি একটু সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পেলুম। বললুম, 'লড়াইয়ের সময় কত রকম গুজব রটে সে সব কি বিশ্বাস করতে আছে? আপনি অধীর হয়ে পড়েছেন তাই অমঙ্গল সংবাদ মাত্রই বিশ্বাস করছেন।'

আবার চোখ মুছে উঠে বসলেন। আমি যে পর-পুরুষ সে কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ আমার দু'হাত চেপে ধরে বললেন, 'মুআল্লিম সায়েব, সত্যি বলুন, ইমান দিয়ে বলুন, আপনি কয় সপ্তাহ ধরে হিন্দুস্থানের চিঠি পাননি?'

হিন্দুস্থানের ডাক শিনওয়ারী অঞ্চল হয়ে কাবুল আসে। তিন সপ্তাহ ধরে সে ডাক বন্ধ ছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। তাঁর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললুম, 'আমি এ সপ্তাহেই দেশের চিঠি পেয়েছি।'

তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন দেখে আমি বললুম, 'আপনি তো আর পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেশেন না যে, হক খবর পাবেন। মেয়েরা সভাবতই একটুখানি বেশী ভয় পায়, আর নানারকম গুজব রটায়, তাই তো বাদশাহ আমানউল্লা পরদা পছন্দ করেন না।'

কর্ত্রী আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, 'যে সব খবর শুনলেন সেগুলো আর কাউকে বলবেন না।'

আমি বললুম, 'এসব খবর নয়, গুজব। গুজব রটালে শুধু কি আপনাদের বিপদ? আমি বিদেশী, আমাকে আরো বেশী সাবধানে থাকতে হয়।'

রাস্তায় বেরিয়ে একা হতেই বুঝলুম, মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার বিড়ম্বনাটা কি। সেটা কাটাবার জন্য পাঞ্জাবী গ্রামোফোনওয়ালার দোকানে ঢুকলুম। আমার গ্রামোফোন নেই, আমি রেকর্ড কিনিনে তবু 'দেশের ভাই শুকুর মুহম্মদ' বলে দোকানদার আমাকে সব সময় আদর-আপ্যায়ন করত। জিজ্ঞেস করলুম, 'মৌলানার বাঙলা রেকর্ডগুলো কলকাতা থেকে এসেছে?'

www.MurchOna.com

দোকানদার বলল 'না,' এবং ভাবগতিক দেখে বুঝলুম খোঁচাখুঁচি করলে কারণটা বলতেও তার বাধবে না। আমি কিন্তু তাকে না ঘাঁটিয়েই খানকয়েক রেকর্ড শুনে বাড়ি চলে এলুম।

কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি খোঁচাখুঁচি কিছুই করতে হল না। স্তরে স্তরে বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম গুজব এসে কাবুলের বাজারে স্তূপীকৃত হতে লাগল। সে বাজার অন্ন বিক্রয় করে অর্থের পরিবর্তে, কিন্তু সন্দেশ দেয় বিনামূল্যে এবং বিনামূল্যের জিনিস যে ভেজাল হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খবরের চেয়ে গুজব রটল বেশী।

কিন্তু এ-বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমানউল্লা অস্ত্রবলে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হননি, এখন যদি অর্থবলে কিছু করতে পারেন।

পূর্বেই বলেছি আফগানিস্থানের উপজাতি উপজাতিতে খুনোখুনি লড়াই প্রায় বারোমাস লেগে থাকে। সন্ধির ফলে কখনো কখনো অস্ত্র-সংবরণ হলেও মিত্রতা-হৃদ্যতার অবকাশ সেখানে নেই। কাজেই আফগান কূটনীতির প্রথম সূত্র: কোনো উপজাতি যদি কখনো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই উপজাতির শত্রুপক্ষকে অর্থ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। যদি অর্থে বশ না হয়, তবে রাইফেল দেবে। রাইফেল পেলে আফগান পরমোৎসাহে শত্রুকে আক্রমণ করবে—কাষ্ঠ-রসিকেরা বলেন সে আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বন্দুকগুলোর তাগ পরীক্ষা করা।

কিন্তু এস্থলে দেখা গেল, বিদ্রোহের নীল-ছাপটা তৈরী করেছেন মোল্লারা এবং তাঁরা একথাটা সব উপজাতিকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যদি কোনো উপজাতি 'কাফির' আমানউল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তারা তখন দীন ইসলামের রক্ষাকর্তা। রাইফেল কিম্বা টাকার লোভে অথবা ঐতিহ্যগত সনাতন শত্রুতার স্মরণে তখন যারা আমানউল্লার পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়বে, তারাও তখন আমান-উল্লার মতই কাফির। শুধু যে তারাই তখন দোজখে যাবে তা নয়, তাদের পূর্বতন অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ যেন স্বর্গদ্বার দর্শন করবার আশা মনে পোষণ না করে।

এ বড় ভয়ংকর অভিসম্পাত। ইহলোকে বন্দুকলগ্ন থাকবে রাইফেল, পরলোকে হুরী, এই পুরুষ প্রকৃতির উপর আফগান-দর্শন সংস্থাপিত। কোনোটাতেই চোট লাগলে চলবে না। কিন্তু প্রশ্ন আমানউল্লা কি সত্যই কাফির?

এবারে মোল্লারা যে মোক্ষম যুক্তি দেখাল তার বিরুদ্ধে কোনো শিনওয়ারী কোনো খুগিয়ানী একটি কথাও বলতে পারল না। মোল্লারা বলল, 'নিজের চোখে দেখিসনি আমানউল্লা গন্ডা পাঁচেক কাবুলী মেয়ে

www.MurchOna.com

মুস্তফা কামালকে ভেট পাঠিয়েছে; তারা যে একরাত জলালাবাদে কাটিয়ে গেল, তখন দেখিসনি, তারা বেপর্দা বেহায়ার মতন বাজারের মাঝখানে গট্‌গট্‌ করে মোটর থেকে উঠল নামল ?'

কথা সত্যি যে, বিস্তর শিনওয়ারী খুগিয়ানী সেদিনকার হাটবারে জলালাবাদে এসেছিল ও সেখানে বেপর্দা কাবুলী মেয়েদের দেখেছিল। আরো সত্যি যে, গাজী মুস্তফা কামাল পাশা আফগান মোল্লাদের কাছ থেকে কখনো গুড কন্ডাক্টের প্রাইজ পাননি।

তবু নাকি এক 'মূর্খ' বলেছিল যে, মেয়েরা তুর্কী যাচ্ছে ডাক্তারি শিখতে। শুনে নাকি শিনওয়ারীরা অট্টহাস্য করেছিল—'মেয়ে ডাক্তার! কে কবে শুনেছে মেয়েছেলে ডাক্তার হয়! তার চেয়ে বললেই হয়, মেয়েগুলো তুর্কীতে যাচ্ছে গোঁপ গজাবার জন্য !'

কে তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে যে, শিনওয়ারী মেয়েরাই বিনা পর্দায় ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, কে বোঝাবে যে, বুড়ীদাদীমা যখন হলুদ-পট্টী বাঁধতে, কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোক্ত, তখন কাবুলী মেয়েরাই বা ডাক্তার হতে পারবে না কেন ? কিন্তু এ সব বাজে তর্ক, নিষ্ফল আলোচনা। আসল একটা কারণের উল্লেখ কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু সেটা কতদূর সত্য, অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। আমানউল্লা নাকি রাজকোষের অর্থ বাড়াবার জন্য প্রতি আফগানের উপর পাঁচ মুদ্রা ট্যাক্স বসিয়েছিলেন।

আমানউল্লা এ সব কথাই আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু আর পাঁচজনের মত তিনিও সেই ফার্সী বয়েৎটী জানতেন, সোনার রক্তিটুক থাকলে মানুষ মরা কুকুরকেও আদর করে। আমানউল্লা সব উজিরদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, উপজাতিকে ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে কে কি জানেন ?

আমার বন্ধু আধা-পাগলা দোস্ত মুহম্মদ ভুল বলেননি; দেখা গেল অনেকেই অনেক কিছু জানেন, শুধু জানেন না, কোন উপজাতির সঙ্গে কোন উপজাতির শত্রুতা, কোন উপজাতির বড় বড় সর্দার উপস্থিত কারা, কাদের মধ্যস্থতায় তাদের কাছে গোপনে ঘুষ পাঠানো যায়, কোন্ মোল্লার কোন্ খুড়ো উপস্থিত কাবুলে যে তার উপর চোটপাট করলে দেশের ভাইপো শায়েস্তা হবেন—অর্থাৎ জানবার মত কিছুই জানেন না।

তখন অনাদৃত উপেক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী বৃদ্ধদের ডাকা হল—তাঁরা বললেন যে, গত দশ বৎসর ধরে তারা কোনো প্রকার কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন না বলে আফগান উপজাতিদের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজানুকম্পা বিগলিত হয়ে যে অর্থবারি তাঁদের পয়ঃপ্রণালী

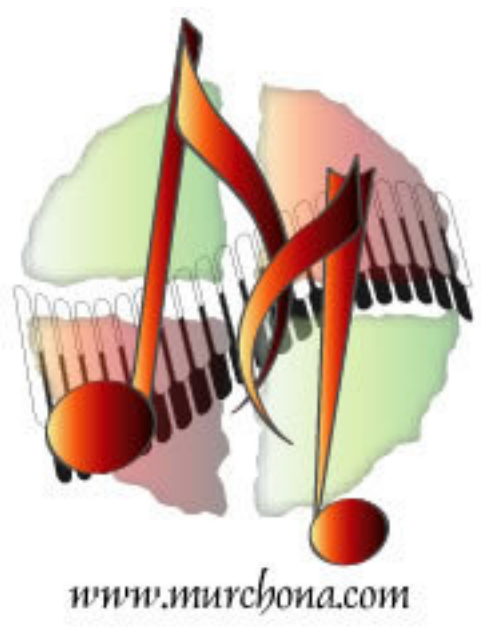

Deshe Bideshe by Syed Mujtoba Ali

[Part.2]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com